কল্লোল রায়

স্পাই

প্রথম মহাযুদ্ধের রোমাঞ্চকর গুপ্তচরদের কাহিনী

স্বর্ণচল প্রকাশক,

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫৯

স্পাই

প্রথম মহাযুদ্ধের গুপ্তচরদের গল্প

●

প্রকাশক
নরেন্দ্র দে
পূর্বাচল প্রকাশক
৬, কলেজ-রো, কলিকাতা—৯

●

মুদ্রাকর
দেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৬-১, কলেজ-রো, কলিকাতা—৯

●

বাঁধিয়েছেন
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
নবীন প্রেস, বাঁধাই বিভাগ
৬, কলেজ-রো, কলিকাতা—৯

●

স্পাই

●

মূল্য : তিন টাকা

কথা-পূর্ব

রাষ্ট্রনীতি ও রণবিজ্ঞান উভয়বিধ শাস্ত্রেই গুপ্তচরের অসীম প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়ে থাকে। রাজ্যশাসন ও যুদ্ধের ব্যাপারে সুশিক্ষিত আরক্ষা ও সৈন্যবাহিনীর মতই কুশলী গুপ্তচরের প্রয়োজন অপরিহার্য।

এ বিষয়ে চরবিদ্যা-বিশারদরা অর্থাৎ সুশিক্ষিত গুপ্তচর যাঁরা তৈরী করেন রাষ্ট্ররক্ষার তাগিদে, তাঁরাই অনেক কথা বলতে পারেন। কোনো দেশ থেকেই এ বিষয়ে সরকারীভাবে কিছু প্রকাশ করা হয় নি বা হয় না। আমি শুধু এ কথাই বলতে পারি যে রামায়ণ ও বাইবেলের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গুপ্তচর-প্রথা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রেই অপরিহার্য পদ্ধতিরূপে অবলম্বিত হয়ে এসেছে। বিভীষণ ও কুইজলিং, ডিলাইলা ও মাতাহারি—একই ঐতিহ্যের বাহক।

আমাদের পুরাণগুলিতে দেবতা ও রাজাদের যুদ্ধজয় ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনীগুলি গুপ্তচর-উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের রাজারা 'চার-চক্ষু' নামে অভিহিত হতেন। রামায়ণে আছে, যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান সর্ব্বানর্থান নরাধিপাঃ। চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানশ্চারচক্ষুষঃ॥ (গোরেসিয়োর রামায়ণ, ৩-৩৭-৯)। অর্থাৎ যেহেতু রাজগণ দূরস্থিত পদার্থসমূহ চারের (চরের) দ্বারা দেখেন, সেজন্য তাহাদের 'চারচক্ষু' বলা হয়।

মনু-সংহিতায় চরের কার্যাবলীর বর্ণনাও রয়েছে: দূত সম্প্রেষণঞ্চৈব কার্য্যশেষং তথৈব চ। অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্॥ (মনু, ৭-১৫৩) অর্থাৎ দূতকে পররাজ্যে কিরূপে প্রেরণ করা যায়, যে কাজ আরব্ধ হয়েছে অথচ শেষ হয় নি, তাহা কিরূপে পরিসমাপ্ত করা যায় স্ত্রীলোকদের ব্যবহার সখ্যাদি দ্বারা কিরূপে অবগত হওয়া যায়, পররাজ্যে যে সকল চর নিযুক্ত করা হয়েছে, চরান্তর দ্বারা কিরূপে তাদের কাজ জ্ঞাত হওয়া যায়, রাজা এসকল বিষয়ে চিন্তা করবেন।

প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরদের পাঁচ ভাগে শ্রেণী বিন্যাস করা হতো—এরই নাম পঞ্চবর্গ, যথা, কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতি-ব্যঞ্জন, বৈদেহিক-ব্যঞ্জন ও তাপস-ব্যঞ্জন। কপট ছাত্ররূপে নিযুক্ত চরের নাম কাপটিক, সন্নাসী গুপ্তচরদের নাম উদাস্থিত, কৃষকরূপে যারা চরের কাজ করতো তাদের বলা হতো গৃহপতি-ব্যঞ্জন, বনিকবেশী চরের নাম বৈদেহিক ব্যঞ্জন আর কপট ব্রহ্মচারীরূপী গুপ্তচরদের আখ্যা দেওয়া হতো তাপস ব্যঞ্জন বলে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই সাধ্যমত গুপ্তচর বাহিনী গঠন করে থাকে। জরুরী অবস্থায় অর্থাৎ আপৎ-কালে এই বাহিনীর ওপর নির্ভরতা বাড়ে। অতীত ইতিহাস প্রমাণ করেছে একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যের একটী বাহিনীর চাইতেও একজন মাত্র কুশলী গুপ্তচরের মূল্য অনেক বেশী হতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থে কেবলমাত্র এই শতাব্দীর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের গুপ্তচর-দের গল্প দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা সকলেই সত্যিকার চরিত্র—ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর দিয়ে সবাই হেঁটে গেছে। কয়েক দশক আগে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় জীবনের রংগমঞ্চে এরা স্বীয় ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে। ইতিহাস আজ গল্প হয়ে উঠেছে এদের নিয়ে।

পুস্তক-প্রণয়নে পুরাতন ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ও বহু বিদেশী গ্রন্থের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। কয়েক স্থানে ইংরাজী বই থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করেও বসিয়ে দিয়েছি। সব মিলিয়ে বলা চলে সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছে আমাকে।

জন্মাষ্টমী, ১৩৫৯

কল্লোল রায়

● মাতাহারি

প্রেমিকদের। বলাবাহুল্য এসব সে আয়ত্ত করেছিল প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ থেকে।

এরপর শুরু হতো তার জীবনচরিতোপাখ্যান। চরিতার্থ হতো তার ভক্তজন, যখন সে সম্মুখের কোচে আলস্য-মন্থর দেহ শিথিল করে অর্ধ-শয়নের ভংগীমায় নিস্তব্ধ কক্ষে মৃদু স্বরে আত্মকাহিনী বিবৃত করতো।

ভক্তদের কাছে মাতাহারির নিজের মুখে বলা কাহিনী হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম। জন্মের পরই তাকে শিবের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে তার জীবন উৎসর্গ করা হয়। যাতে উপযুক্ত দেবদাসী হতে পারে এই অভিপ্রায়ে বাল্যকাল থেকেই তাকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে।

'তারপর যখন আমার যৌবন প্রস্ফুট হয়ে উঠলো, আমার পালিকা-মাতা স্থির করলেন আগামী বসন্তে শক্তিপূজার রাত্তে আমার নিকট উন্মোচন করে দেবেন প্রেম ও বিশ্বাসের রহস্য-দ্বার। তেরো বছর বয়সে দেব-দেউলের পাষাণ-চত্তরে সেই প্রথম আমি সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে নৃত্যরতা হলাম।'

তারপর সেই মন্দিরে একদিন এলো এক ইংরেজ। নৃত্য পটীয়সী এই মেয়েটীকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে করলো বিবাহ। তারপর তাদের হলো একটী সন্তান—দুর্ভাগ্যবশত ছেলেটীকে তাদের ভৃত্য বিষপ্রয়োগে হত্যা করে, ফলে মাতাহারি ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃত্যটিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল।

মাতাহারির মুখাবয়ব ছিল প্রাচ্য দেশবাসীদের মত। তার গল্প বলার ভংগীটাও ছিল ভারতীয়দের মত। তাই ভক্তরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে ডাচ মহিলাটিকে মনে করতো ভারতীয় বলে। গ্রেপ্তারের

ফ্রান্সের উঁচু তলার সমাজ জয় করবার পর মাতাহারি বার্লিনে যায় নাচ দেখাতে। জার্মান পুলিশের কড়া নজর ছিল নর্তকী বা বা অভিনেত্রীদের পরিচ্ছদের শালীনতার ওপর। মাতাহারি এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবেই অপরাধী হয়ে বার্লিন পুলিশের কর্তার সম্মুখীন হয়। শীঘ্রই দেখা যায় উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঘটেছে এবং মাতাহারির জন্য পুলিশ সুন্দর একটী বাস-ভবন জোগাড় করে দিয়েছে।

সেই সময়ই জার্মান সিক্রেট সার্ভিস তৎপরতার সংগে মাতাহারিকে গোপন বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল। বিদেশী পদস্থ ব্যক্তিদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে এনে মাতাহারি তার আড্ডাখানায় এমন সব কাণ্ড কার-খানা করতে লাগলো যে, অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লো ঐসব ভদ্রলোকেরা। তাদের বশীভূত করে পরবর্তীকালে পুলিশের কাজে আসতে পারে এমন সব তথ্য নথিভুক্ত করে রাখতো সে। ফ্রান্স, রুশিয়া, ইতালির নামকরা ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে এই ধরণের কতকগুলি তথ্য লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে মাতাহারি জার্মানীর ইনটেলিজেন্স বিভাগকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই সংগ্রহ-কেতাবটী বহু বছর ধরে জার্মান পুলিশের দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত ছিল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল তা কোনোদিনই সিদ্ধ হয়নি।

১৯১০ সালে মাতাহারিকে গোয়েন্দা-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করার জন্য ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত লোরাচে প্রেরণ করা হয়। এখানে ঝানু গুপ্তচররা নবাগতদের শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে তুলতো। এখান থেকে ফিরে এসে মাতাহারি নিজেকে তার নূতন পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলে। প্যারীর কৃষ্টি, যা সে আহরিত করেছিল, সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে রাতারাতি যেন সে জার্মান নাগরিকা হয়ে উঠলো।

সে জানিয়েছিল তার ন্যুইলি-স্থ সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্যই তার ফ্রান্সে যাওয়া প্রয়োজন।

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস থেকে মাতাহারিকে তার খরচার জন্য ত্রিশ হাজার মার্ক দেওয়া হয়েছিল। টাকার লেনদেনের এই ব্যাপারটা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছিল—তাই মাতাহারির লক্ষ্যস্থল প্যারী জানামাত্রই ওরা ঐ খবরটা প্যারীর সেকেণ্ড ব্যুরোকে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু মাতাহারির বিরুদ্ধে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে তার বিরুদ্ধে কিছুই করা যাচ্ছিল না। প্যারীতে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার পর মাতাহারির হল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন না করার পক্ষে যখন আর কোনো যুক্তি রইলো না, তখন সে জানালো, সে রেডক্রশে আত্মনিয়োগ করেছে আর Chemin des Dames অঞ্চলের ভিত্তেল শহরের হাসপাতালের ডিউটিতে তাকে বহাল করা হয়েছে।

১৯১৫ সালের মে ও জুন মাসে আর্তয়ে আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হলে স্থির হয় যে মিত্রশক্তি শ্যাম্পেন ও আর্তয়ে যুগপৎ ব্যাপক আক্রমণ চালাবে। কোথায় আক্রমণ হবে শত্রুপক্ষ যাতে পূর্বে বিন্দুমাত্রও না আঁচ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মের সময় ভসজেস ও আর্গনে ফরাসীদের স্থানান্তরিত করা হয়। ফরাসীদের রক্ষা-ব্যবস্থা এই সময়ে এমন সুসম্পূর্ণ বলে মনে হয় যে রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চলগুলি থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নূতন নূতন ডিভিসন তৈরী হতে থাকে, আর সৈন্যদের জোর মহড়াদেওয়া হয়। পূর্ব রণাংগনের ওপর থেকে চাপ কমানো আর জার্মান সৈন্যবাহিনীকে বামদিক থেকে পর্যুদস্ত করে উত্তরে রাইন নদী

ক্যাপ্টেন মারভের প্রতি তার সুস্পষ্ট প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ করা না গেলেও এটুকু বলা যায় মাতাহারি তার আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয় নি। মিত্রশক্তির সম্ভাব্য আক্রমণের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। ক্যাপ্টেন মারভকে নিতান্ত দৈবক্রমে পাওয়ায় সে ভিত্তেলে অবস্থানের চমৎকার কারণ দেখাতে পেরেছিল।

এই সময় সৈন্যদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে যায়। মাতাহারি বিমানবাহিনীর সৈনিকদের সব চেয়ে বেশী পছন্দ করতে থাকে। বহু যুবক বৈমানিক তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছুটি কাটাতে থাকে। তারা এই প্রেয়সী নারীর নিঃসংগ অবকাশ বৈচিত্র্যে মধুর করার আশায় বিমানবহরের নানা গল্প বলতো, মাতাহারিও কৃত্রিম সারল্যের সংগে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করে নিতো। হতভাগ্যরা জানতেও পারতো না ছলনাময়ী তাদের ওষ্ঠে সুরাগন্ধী চুম্বনের সাথে মৃত্যুর স্বাক্ষর এঁকে দিত।

ক্যাপ্টেন মারভকে সম্মুখে রেখে মাতাহারি এইভাবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে, এসব তথ্য প্রকাশিত হবার পর, অনেকে এজন্য মারভকে মাতাহারির অপরাধ-সহচররূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ প্রসংগে একথা সুস্পষ্টরূপে বলা যায়, ক্যাপ্টেন মারভ মাতাহারির চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। শুধু আশ্চর্য এই যে মিত্রপক্ষের সৈনিক মারভ ও জার্মানীর গুপ্তচর মাতাহারির প্রেম নিঃসন্দেহে ছিল অকৃত্রিম।

মাতাহারির উদ্দেশ্য সামরিক মহলে সন্দেহের উদ্রেক না করলেও সেকেণ্ড ব্যুরোকে সে প্রতারিত করতে পারে নি। মাতাহারির সম্বন্ধে সেকেণ্ড ব্যুরোর বিন্দুমাত্রও ভ্রান্তি ছিল না। তাদের নজর ওর ওপর কোনোদিনও শিথিল হয় নি, যদিও তারা এখন আগের

মতই ব্যর্থ হলো মাতাহারির ক্যর্যকলাপের একটু রহস্য-সূত্র আবিষ্কার করতে।

বহু-প্রতীক্ষিত আক্রমণের দিন অগ্রসর হয়ে আসছিল। জুন ও জুলাই মাস কেটে গেল আয়োজনের উত্তেজনায়। কিন্তু কোন্ ফাঁকে আক্রমণের তারিখ ও আক্রমণ স্থলের নির্দেশ পৌঁছে গেল শত্রুপক্ষের হাতে জানতেও পারলো না মিত্রশক্তির গুপ্তচর প্রতিরোধ বিভাগ। তাদের ধারণা ছিল শত্রুপক্ষ এ বিষয়ে কিছুমাত্র জানতে পারে নি।

সেপ্টেম্বর ২৫ তারিখে দুপুরের সামান্য পরে পদাতিকদের আক্রমণ শুরু হলো আর্তয়ে। আক্রমণের আকস্মিকতায় শত্রুপক্ষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। জার্মান ব্যারাজ (গোলন্দাজ বাহিনীর সমাবেশ) নামলো অনেক দেরীতে, বিশৃঙ্খলায় তারা তাদের পদাতিকদের রক্ষা করতে পারলো না। ভিমি রিজ রক্ষার জন্য জার্মান রিজার্ভ বাহিনীও আসতে পারলো না। তিন দিন ধরে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল দুর্মর ফরাসী বাহিনী।

কিন্তু আরো দক্ষিণমুখী আক্রমণে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো ফরাসীদের। আক্রমণের পরিকল্পনার সময় জানা গিয়েছিল সেখানে জার্মানদের ৯০ ব্যাটালিয়ন প্রতিরক্ষা-সৈন্য ছিল। আক্রমণ শুরু হলে দেখা গেল শত্রুশক্তি এখানে ১৯২ ব্যাটালিয়নে বাড়ানো হয়েছে। প্রচণ্ড গোলা বর্ষণে সামান্য অগ্রগতি সম্ভব হলেও ফলাফল সম্বন্ধে যে উচ্চাশা পোষণ করা হয়েছিল, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। হিসাব করে দেখা গেল ফরাসীদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ৮০,০০০ আর আহত ১০০,০০০।

আগষ্টের মাঝামাঝি আক্রমণের তারিখ ও স্থল জার্মানদের কাছে পৌঁছেছিল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রতারিত হয়েছিল জার্মানীর গুপ্তচরদের দ্বারা, আর ফরাসী গুপ্তচর প্রতিরোধ বিভাগ এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছিল।

তার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে নি। সেসময়ে তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তার প্রশ্নত-খ্যাতি রূপ-লাবণ্য তখন ম্লান হয়ে আসছে।

মাতাহারি বুঝতে পারে নি যে হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ব্রিটিশ এজেণ্টরা ইতিপূর্বেই তার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ পেয়েছে। তাই সে আমষ্টারডামে পৌছেই সেখানকার এক তামাকের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলো। ম্যাকস ম্যুডের নামক একটী লোক সেই দোকানের মালিক—দোকানটী যে বিভিন্ন জার্মান গুপ্তচরের 'ডাকবাক্স', তা ব্রিটিশ গুপ্তচরদের অজানা ছিল না। লণ্ডন ও প্যারীতে অনতিবিলম্বে মাতাহারির এই দোকানে আসার সংবাদ পৌছে দেওয়া হলো।

এই সময় জার্মান কর্তৃপক্ষ একজন ব্রিটিশ গোয়েন্দার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। গোয়েন্দাটীর নাম 'মিঃ সি'—আসল নাম সিডনি রিলি। জার্মান নৌ-দপ্তর থেকে একটী মূল্যবান পরিকল্পনা চুরি করে নিয়ে আসা এরই কীর্তি।

জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে এক দিন হুকুম আসে সম্রাটের কাছ থেকে নৌ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশ আনার জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মচারীকে পাঠাতে। একজন অখ্যাত জুনিয়র অফিসারকে পাঠানো হয়। নূতন ডুবো-জাহাজ সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যার সময় এই লোকটীর বিচক্ষণতা এবং সামরিক ও নৌ-সংক্রান্ত ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া আলোচনা-কালে সে বহু জটিল ব্যাপারও ভালো করে বুঝে নেয়। তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সম্রাট এত খুসি হন যে তাকে ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করেন।

সিডনি রিলি কিভাবে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের চোখ এড়িয়ে নৌদপ্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং সম্রাটের পরিকল্পনা লণ্ডনে প্রেরণ করেছিলেন, সেটা আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

সুবিধাজনক। আমার এক কূটনীতিজ্ঞ বন্ধু বলেছিলেন যে শত্রু অধিকৃত দেশগুলির গুপ্তচরদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া নাকী খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমি তাই প্রস্তাব করেছি বেলজিয়মে আপনাদের যে সব গুপ্তচর আছে তাদের কাছে আপনাদের নির্দেশ বহন করার কাজে আমাকে নিযুক্ত করা হোক।

সেকেণ্ড ব্যুরো থেকে বলা হলো, যাত্রার পূর্বে তাকে বেলজিয়ামস্থিত মিত্রপক্ষীয় গুপ্তচরদের একটী তালিকা ও সেকেণ্ড ব্যুরোর নির্দেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তার হাতে দেওয়া হবে।

মাতাহারিকে কখনোই মিত্রপক্ষের গোয়েন্দাবিভাগ বিশ্বাস করে নি। তাই তার হাতে স্বপক্ষীয় গুপ্তচর বলে বর্ণিত এমন বারোজন লোকের নাম ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, যাদের একজন ছাড়া আর সব ব্যক্তিই ছিল কাল্পনিক। সত্যিকার যে গুপ্তচরটীর নাম দেওয়া হয়েছিল, সে মোটেই বিশ্বাসভাজন ছিল না, কিছুদিন যাবৎ লোকটী একবার জার্মান আরেকবার ফরাসীদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে বেড়াচ্ছিল নিজের সুবিধামত।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ মাতাহারির যাত্রার ব্যবস্থা করে দিল। প্রথমে ইংল্যাণ্ড তারপরে হল্যাণ্ডগামী জাহাজে চড়ে সে তার অভীপ্সিত স্থানে যেতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে মাতাহারির গমন সম্বন্ধে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই সেখানে তাকে কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হলো না, যদিও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তাকে পূর্বের মতই সন্দেহের চোখে দেখছিল। বার্থ পেতে বিলম্ব হওয়ায় মাতাহারি লণ্ডনে রইলো কয়েকটা দিন। সেই সময়টা ডোভার বন্দরের যুদ্ধ সামগ্রীর পরিমাণ সম্বন্ধে একটা আঁচ করে নিলো সে, লণ্ডন নগরীতে বিমানাক্রমণের সম্ভাব্য ফল ও প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও দেখে নিলো। তারপর একদিন হৃদয়ে

ফরাসীদের চর। মাতাহারির বিরুদ্ধে শত্রুর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির আরেকটী প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে সময়ে সে শোচনীয় অর্থাভাবের কারণ দেখিয়ে সেকেণ্ড ব্যুরোর অধীনে নিযুক্ত হবার প্রার্থনা জানিয়েছিল, তখন অনুসন্ধানে ব্যাংকে তার নামে একটা বৃহৎ অংকের জমা দেখা গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার আরো একটী কারণ হচ্ছে জার্মান ডুবোজাহাজ কর্তৃক আলজিরিয়ায় ও মরক্কোয় অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারটা তার পক্ষে জানা। ঐ ধরণের সংবাদ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে জানা একান্ত অসম্ভব। তাই তার হল্যাণ্ডে যাবার ইচ্ছা দেখে সেকেণ্ড ব্যুরোর ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই সে ফরাসী সরকারী মহলের প্রণয়ী বন্ধুদের কাছ থেকে অতি মূল্যবান কোনো তথ্য হস্তগত করেছে এবং সেটী তার হল্যাণ্ডে জামান কর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই-ই।

ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে সেকেণ্ড ব্যুরো মাতাহারিকে আটক করতে উৎসুক হলো। কিন্তু আটকের ফলে মাতাহারি সতর্ক হয়ে উঠতে পারে আর তার বিরুদ্ধে মিত্র-পক্ষের সন্দেহ উপলব্ধি করতে পারবে। তাই তার যাত্রায় কোনোরূপ বাধা না দিয়ে তার হাতে গুপ্তচরদের তালিকাটি দিয়ে মাতাহারি কোন সুড়ংগ পথে জামান কর্তৃপক্ষের হাতে সেটা তুলে দেয় দেখার জন্য সেকেণ্ড ব্যুরো সজাগ হয়ে রইলো।

কিন্তু আশ্চর্য যে সেকেণ্ড ব্যুরোর সতর্ক দৃষ্টি এবারও হার মানলো। বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরটীর জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে মৃত্যু হওয়াতে মাতাহারি সম্বন্ধে সেকেণ্ড ব্যুরোর আর কোনো সংশয়ের অবকাশ রইল না। লণ্ডন পুলিশের পরামর্শ মত আরো কিছুকাল ধরে তার ওপর যথেষ্ট কড়া নজর রাখা হলো কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলে মনে হতে লাগলো। অগত্যা ঠিক হলো এই বিপজ্জনক নারীকে আর এভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া সংগত হবে না।

দিয়ে আর এইচ-২১ এই নামের আড়ালে তোমাকে গোপন রাখতে চেয়ে—

মাতাহারি বল্ল, যাতে আমি আমার বন্ধুদের সংগে প্রণয়সংক্রান্ত চিঠি-পত্রাদি চালাতে পারি সেজন্য ঐ নামই আমি গ্রহণ করি, আর ত্রিশ হাজার মার্ক আমি নিয়েছিলাম গোয়েন্দা বৃত্তির জন্য নয়। ওটা আমার কৃপা বিতরণের মূল্য, আমি গোয়েন্দা পুলিশের কর্তার প্রণয়িনী ছিলাম।

সন্দিগ্ধ স্বরে বিচারক প্রশ্ন করলেন, অফিসারটী অস্বাভাবিক রকমই মুক্তহস্ত বটে।

অস্বাভাবিক! ত্রিশ হাজার মার্ক অস্বাভাবিক নয়, ওটা আমার স্বাভাবিক মূল্য। আমার প্রণয়ীরা এর কমে কখনো দেয় নি—

প্রশ্ন করা হলো: আলজেরিয়া ও মরোক্কোয় জার্মানী কর্তৃক অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ কোথা হতে সংগৃহীত হয়েছে? নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এবং শত্রুপক্ষের নির্দেশে সেকেণ্ড ব্যুরোর আস্থা অর্জনের অভিপ্রায়ে প্রচারিতও হয়েছে।

মাতাহারি জবাব দেয়, কয়েকজন কূটনীতিকের ভোজের টেবিলে শুনেছিল সে। কিন্তু কোথায় তা কিছুতেই বলতে পারে না।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, ক্যাপ্টেন লেঁহু তোমার হাতে গুপ্তচরদের নামের যে তালিকা দিয়েছিলেন সেটা বেলজিয়মে আমাদের অন্যতম গুপ্তচরদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা ছিল। কি করা হয়েছে সেটা?

কোনো জবাব দিতে পারে না মাতাহারি।

—যে এজেণ্টটীর কাছে তোমার রিপোর্ট দেবার কথা ছিল, ব্রুসেলসে জার্মানরা তাকে গ্রেপ্তার করে। প্যারী থেকে তোমার যাবার তিন সপ্তাহ পরে তাকে গুলি করে মারা হয়।

বন্ধু। তাই আনন্দের সংগে আমরা একত্র মিলিত হয়ে তিনদিন কাটাই। একে জিজ্ঞাসা করুন কোনো সংবাদ আমি এর কাছ থেকে পেতে চেয়েছিলাম কিনা কিম্বা ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কোনো গুপ্ত তথ্য জ্ঞাত হয়ে লাভবান হবার চেষ্টা করেছি কিনা—

সাক্ষী জবাব দিলেন, মাদাম কখনো এই ধরণের প্রশ্ন আমায় করেননি।

কোর্ট মার্শালের সভাপতি বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, তবে তিনদিন ধরে কি কথা আপনাদের হয়েছিল? জাতি যখন যুদ্ধরত, তখন ঐ ধরণের কথাবার্তাই তো স্বাভাবিক।

—আমরা আর্ট, কেবল ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম—

এরপর ফ্রান্সের একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর একটী পত্র পাঠ করা হলো। মাতাহারির সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পূর্ণ পত্রটী। বলা বাহুল্য এগুলিতেও মাতাহারির পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হলো না। তারপর তার উকিল মঁসিয়ে ক্লুনেট বক্তৃতা দিলেন। যেই বক্তৃতাটি আজো প্রকাশিত হয়নি। এর পর বিচারকার্য সমাপ্ত বলে ঘোষণা করা হলো। এবং দশ মিনিট পরামর্শের পর কোর্ট-মার্শালের বিচারকমণ্ডলী একমত হয়ে রায় দিলেন :

রূপ ও সৌন্দর্যময়ী এবং ব্যক্তিত্বময়ী এই নারীকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা বিভৎস হলেও চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রজালে সে বিপত্তির পর বিপত্তির সৃষ্টি করেছে, মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কোনো শাস্তিই তার প্রাপ্য নয়।

জুনের মনোরম সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় যখন তার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন কি ঐ নর্তকীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল সেই বিরাট বাহিনীর মার্চের পদধ্বনি যা পরম বিশ্বাসে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তারই চক্রান্ত-বিলাসে?

ক্রিয়াকলাপের উত্তাপ যাঁর রেজিমেণ্টকেও স্পর্শ করেছিল, তাঁর বিবরণী অনেকখানি প্রামাণ্য মনে করা যেতে পারে। স্পেনের ন্যাভাল এ্যাটাচি মাতাহারির শেষবারের প্যারী-যাত্রার প্রাক্কালে আমষ্টারডামের জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে তার যাত্রার কথা জানিয়ে তার জন্য ত্রিশহাজার মার্ক পাঠাবার অনুরোধ করে যে সাংকেতিক ভাষায় তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, মেজর কুলসনের মতে, সেই সাংকেতিক ভাষার সমাধান-সূত্র দৈবক্রমে ইতিমধ্যে ফরাসীদের হস্তগত থাকায় তারবার্তার মর্মার্থ বোধগম্য হতে দেরী হয়নি। মার্কিন সাংবাদিক কার্ট সিংগার এ-প্রসংগে ভিন্ন কথা বলেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য সেটা উধৃত করে দিচ্ছি।

স্পেনে নৃত্য-প্রদর্শনের চুক্তিতে মাতাহারি যখন মাদ্রিদে আসে, তখন স্পেনস্থ জার্মান ন্যাভাল এ্যাটাচির সংগে তার প্রগাঢ় হৃদ্যতা জমে। মাদ্রিদের বিখ্যাত নৈশক্লাব ত্রোকাদেরোতে রাতের পর রাত ওরা আসতো দুজনে। ন্যাভাল এ্যাটাচি ভদ্রলোকের প্রুশিয় আভিজাত্য মুগ্ধ করেছিল মাতাহারিকে। প্রথম দিনের চটুল আলাপ ক্রমশ দুজনের মধ্যে পরিণত হলো ভালোবাসায়। মাতাহারিকে যুবক অফিসারটী বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলে।

প্যারীতে গিয়ে মাতাহারি যখন একদিকে নাচের আসর জমিয়েছিল আর অন্যদিকে গুপ্তচরের কাজ করছিল, তখনো তার মন প্রতিশ্রুতির রঙীন স্বপ্নে মসগুল। অফিসারটী জানিয়েছিল প্যারী থেকে ফিরে এলে মাতাহারিকে বিবাহ করে বার্লিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো, স্পেন থেকে অফিসারটীর চিঠিগুলিও তত নীরস হয়ে আসছিল। আশ্চর্য, ছলনাময়ী পুরুষের ছলনার কাছে পরাস্ত হয়েছিল। যুবক অফিসারটীর কর্তব্য আগে—পরে প্রেম। আর মাতাহারি জার্মান নয়, প্রুশিয় নাগরিকের সংগে বিবাহের স্বপ্ন দেখা

• মার্থা ম্যাকেন্না

জীবনকাহিনী পড়ে তিনি বলেছেন, মার্থার গল্প এতই রোমাঞ্চকর যে পড়তে আরম্ভ করে ভোর চারটে না হওয়া পর্যন্ত আলো নিভাতে পারিনি।

মার্থার আত্মকাহিনী সত্যি চমকপ্রদ।

১৯১৪ সালের ২রা আগষ্টের রাত্রিবেলায় বেলজিয়মের ওয়েষ্ট্রসবেকের পুরোনো গোলাবাড়ীর রান্নাঘরে ঢুকে আমার বাবা বল্লেন, জার্মানরা বেলজিয়ম আক্রমণ করেছে। রাজা আলবার্ট রণসজ্জার হুকুম দিয়েছেন। পয়লা ট্রেণেই আমাদের ছেলেরা তাদের ডিপোর উদ্দেশে যাত্রা করবে। ঈশ্বরই জানেন কি ঘটবে! জার্মান দস্যুদের রুখতে পারবে না বেলজিয়ম।

মা আমাকে বল্লেন, মার্থা, বাইরে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে এসে খবরটা জানিয়ে দাও। তারপর বাবার দিকে ফিরে বল্লেন, এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। দস্যুদের রুখবার জন্যে ফরাসীরা শীঘ্রই আমাদের ছেলেদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে আসবে।

ওয়েষ্ট্রসবেকে আমরা এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের কথা শুনলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না। তারপর ক্রমশ লড়াইয়ের আবহাওয়ায় সরগরম হয়ে উঠতে লাগলো আমাদের গ্রামটী। দিনের পর দিন ধরে নানা গুজব ফ্লাণ্ডার্সে প্রচারিত হতে থাকলো। তারপর একদিন শোনা গেল দূরাগত কামানের গর্জন। রাত্রির আকাশের দিগন্ত রেখায় দেখা যেতে লাগলো তীব্র আলোকরেখার আকস্মিক বিচ্ছুরণ। পিছু হটতে লাগলো আমাদের সৈন্যেরা। লীজের পতন হলো, লুডেনডর্ফের লৌহ পদক্ষেপের নির্মম পেষণে ধূলিসাৎ হলো তার অনেকগুলি বন্দর। প্রত্যহ প্রভাতে আমরা শুনতাম দুর্ধর্ষ জার্মান

ব্রুলার্সের হাসপাতালে আমাকে সাদরে গ্রহণ করা হলো। হাসপাতালে আমিই একমাত্র নার্স। রাত্রে সেখানে সান্ধ্য-আইনের কড়াকড়ি। প্রয়োজন হলে রাত্রেও এসে যাতে ডিউটি দিতে পারি, এজন্য আমাকে রাত্রির চলাফেরার মঞ্জুরীনামা দেওয়া হলো!

একপক্ষকাল পরে, নাইট-ডিউটি সেবে সবেমাত্র সকালে বাড়ী এসেছি হঠাৎ আমাদের খিড়কির দরজার হাতল ঘুরিয়ে নিঃশব্দে একজন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। লুসিল ডেল্‌ডন্‌ক! আমি অবাক হয়ে গেলাম তাকে দেখে—ওয়েষ্ট্রসবেকে বন্দী থাকার সময় একদিন সে অন্তর্হিতা হয়। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আমাদের চুপ থাকতে বলে ফিস্ ফিস্ করে সে বল্ল, কেউ যেন না জানতে পারে আমি এসেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে তুমি আসছো লুসিল?

সীমান্তের ওপার থেকে। তোমার জন্য সংবাদ আছে। তোমাদের তিন ছেলেই ভালো আছে সৈন্যবাহিনীতে। আমাদের সবাইও ভালো আছে, কিন্তু মাত্র এই খবর দেবার জন্যই আমি হল্যাণ্ড থেকে চল্লিশ মাইল হেঁটে আসিনি। কারণ জার্মানরা যদি জানে আমি এখানে তাহলে—

কথা বন্ধ করে আশেপাশে একবার দেখে নিল সে। তারপর বল্ল, মার্থা, তোমার বয়স অল্প আর বেশ শক্ত মেয়ে তুমি। তোমার স্বদেশকে সেবা করতে চাও না?

সে কি বলতে চায় বুঝতে পারলাম। গুপ্তচর। আমি জানতুম বেলজিয়মে অনেক গুপ্তচর আছে, তারা তাদের স্বদেশকে সেবা করছে। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তিকে তখনো পর্যন্ত আমি উদারতার চোখে দেখতে শিখিনি! কিন্তু না বলে উঠলেন, আমার তিন ছেলেকে আমি দেশের সেবায় ছেড়ে দিয়েছি। মার্থাকেও আমি দেশের জন্য ছেড়ে দিতে পারি স্বচ্ছন্দে, সে যদি চায়।

রুলাসে'র রেল-ষ্টেশনে সপ্তাহে একবার করে গোলা-বারুদ বোঝাই ট্রেন এসে দাঁড়ায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেনের মাল খালাস হয়ে যায়। এই তথ্যটুকু আমি জেনে নিয়ে ছিলাম, শুধু জানতাম না কবে এবং কখন এসে ট্রেন দাঁড়াবে। এটুকু লক্ষ্য করেছিলাম যে ট্রেন আসার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই, আর প্রত্যেক সপ্তাহে বার-বদল হয়।

একটি সপ্তাহান্তিক ট্রেনের আসার দিন ও সময় জানতে পারলে ৬৩ নম্বরের মারফৎ খবরটি ব্রিটিশ বিমান-বহরকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং ষ্টেশনটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় বোমার ঘায়ে। খবরটা পাওয়া যেতে পারে জার্মান সামরিক রেল-চলাচল বিভাগের কোনো কর্তা-ব্যক্তির কাছ থেকে—এই আশায় এমনি কোনো একজনের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছায় কয়েকদিন ধরে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেড়াতে লাগলুম।

ষ্টেশনে যাওয়া আসায় আমার পক্ষে কোনো বাধাই ছিল না, কারণ ট্রেনে যে সব আহত সৈন্য আসতো, তাদের নামিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে হতো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

একদিন বিকালে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছি, পিছন থেকে মোটা গলায় বলতে শুনলাম, ফ্রয়লাইন, আপনাকে প্রায়ই এখানে আসতে দেখে ভারী আনন্দিত হই—

বেঁটে মোটা একজন অফিসার মৃদু হাসির সংগে আমাকে অভিবাদন করলে। আমিও মিষ্টি হেসে বললাম, আজকের চমৎকার আবহাওয়া উপভোগ করার জন্যই বেড়াচ্ছি। হাসপাতালে এখন কাজের চাপ কম, হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় রয়েছে। হের হেপ্টম্যান*, আপনারা অবশ্য খুবই কাজে ব্যস্ত এখন—

---

* জার্মান সেনাবাহিনীতে হেপ্টম্যানের মর্যাদা ব্রিটিশ সৈন্যদলে ক্যাপ্টেনের সমান।

আমি সেখানে আসতেই একজন বল্‌লে, ফ্রয়লাইন, বলতে পারেন লুসিল ডেলডন্‌ক নামের স্ত্রীলোকটার কি হয়েছে? অল্প কদিন আগেও তাকে রুলার্সে দেখা গেছে।

আমার বুকের ওপরে প্রকাণ্ড একটা কিছু এসে যেন আঘাত করলো। কিন্তু আমাকে ভাববার অবসর না দিয়েই ফের প্রশ্ন করা হলো, লুসিস ডেলডন্‌ক কোথায় এখন?

আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইলো। ওরা নিশ্চয়ই আমার দ্বৈত কর্মধারা জানতে পেরেছে। স্নায়ুগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। কিন্তু মোলায়েম গলায় ওরা বলল, ভয় পাবেন না ফ্রয়লাইন। আপনি যা জানেন তাই বলুন।

আমি সাহস সঞ্চয় করে জবাব দিলাম, যে সময় আপনাদের সৈন্য ওয়েষ্ট্রসবেকের সেলারে হানা দেয়, তখন থেকেই লুসিল নিরুদ্দেশ। আমার অনুমান তাকে জার্মান সৈন্যরা মেরে ফেলেছে। কারণ অধিকাংশ সৈন্যই তখন পানোন্মত্ত আর যথেচ্ছভাবে অস্ত্র ব্যবহার করছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনর্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে আপনি ঠিক বলছেন ওঁকে এখানে দেখেন নি? ভালো করে ভেবে দেখুন। কয়েকদিন আগেও কি সে এই ঘরে আসে নি?

এবার আমি ওদের চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি রেখেই বলে দিলাম, না। ওয়েষ্ট্রসবেক ছাড়ার পর থেকে আমি আর ওর দেখা পাই নি।

ওরা চলে যাবার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম। ওরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানতে পারে নি। তারপর ভাবতে লাগলাম ৬৩ নম্বরের মারফৎ যে বার্তা প্রেরণ করেছি, রুলার্সে তার ফলাফল কিরূপ হবে। ইংরেজরা কি সমস্ত শহরটাতেই বোমা ফেলবে?

কাদা-মাটি ছিটকে এসে পড়ছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওরা মর্ফিয়া চাইছিল।

এখানে অভাব মর্ফিয়ার। তাদের তুষ্টি বিধানের জন্য মর্ফিয়ার লেবেল মারা বোতলে শাদা জল পুরে তাই ইঞ্জেকশন করতে হচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় একটি বেসামরিক ব্যক্তির যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা করতে গিয়ে চমকে উঠলাম। তার কোটের কলারে দুটো সেফটি-পিন—সেগুলি আড়াআড়ি নয় সোজাসুজি। লোকটিকে দুজন সামরিক পুলিশ নিয়ে এসেছে। খানার মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেছে কে নাকি তার গলা কাটবার চেষ্টা করেছিল।

বাড়ী ফিরে নবাগত লোকটিকে সেকথা জানালাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আক্রান্ত ব্যক্তিটি নিশ্চয় জার্মান ভ্যাম্‌প্যায়ারদের একজন। নবাগত লোকটির সংগে কথা কইবার সময় আততায়ীর সম্বন্ধে আমার আর কোনো সন্দেহই রইলো না, যখন সে শুধু নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, মারা গেছে লোকটা ?

ঊনিশ শো পনেরো সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে আমার বাবা ক্যারিলন কাফের ভার গ্রহণ করলেন। কাফেটির মালিক রণক্ষেত্রের এত কাছে থাকা পছন্দ না করে সপরিবারে আরো দূরে চলে গেলেন। গোড়া থেকেই সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাফেটি বেশ জমে উঠলো। কাফের কাজের সুবিধা হবে বলে মা দুটো মেয়েকে পরিচারিকা নিযুক্ত করলেন আর আমিও হাসপাতালের কাজের পর কাফের কাজে সহায়তা করতে লাগলুম।

ষ্টিফ্যানের কাছ থেকে জানতে পারলাম অনেক কথা। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্সে সেন্সর অফিসার বিশেষ ব্যস্ত থাকলে ষ্টিফ্যান খাম থেকে চিঠিপত্র বার করে অফিসারের সামনে রাখে, তারপর দেখা হয়ে গেলে ফের ভর্তি করে দেয় খামে। সেন্সর অফিসারেব অনেক সময় আসতে দেরী হয়ে যায়, লাঞ্চের সময়ও বিলম্ব ঘটে। সেই সময়ই ষ্টিফ্যানের পক্ষে খাম থেকে চিঠি বার করে পড়ে নেবার সুবিধা হয়। আলাদা বস্তায় অফিসারদের যেসব চিঠিপত্র আসে, জ্ঞাতব্য মালমশলা সেগুলোতেই থাকে বেশী। তাই ষ্টিফ্যান সেগুলোর দিকে আগে দৃষ্টি দেয়। অফিসারদের চিঠির বস্তা থেকে ষ্টিফ্যান একদিন কে এক অটো ফন প্রম্‌টের তার মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি দেখতে পায়। সেটা পড়ে সে বুঝতে পারে লোকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রুলার্সে এসেছে, কাজটা যেমন সহজ তেমনি আকর্ষনীয় বটে। ষ্টিফ্যান এই লোকটীর সন্ধান করতে করতে অবশেষে তাকে এই কাফেতেই আবিষ্কার করেছে। লোকটির সকলের সংগেই দিলখোলা ব্যবহার আর খুব মেশামেশি দেখে আর সামরিক বা পুলিশবিভাগীয় কোনো কাজই তার না থাকায় ষ্টিফ্যানের অনুমান লোকটি বিপজ্জনক।

ওরা আমাকে আরেকটি খবর দিল। রুলার্সে শেষ যে ট্রেনটি এসেছিল, তাতে অনেকগুলি লম্বা ধাতুনির্মিত সিলিণ্ডার এসেছে। কি আছে ওতে আর কি উদ্দেশ্যে এসেছে তা ওরা জানতে পারেনি। আমাকে এ-সম্বন্ধে খবর নিতে বল্ল।

আমাদের কাফেতে অটো ছাড়া আরো দুজন জার্মান অফিসার ছিল। হাসপাতালের ডিউটির পর বাড়ীতে এসে যখন বিশ্রাম করতাম, তখন দেখা হলে ওরা আমার সংগে গল্প করতো, কখনো কখনো বা ডিনারের আমন্ত্রণ জানাতো। কদিন ধরে লক্ষ্য করছি ওরা কেমন উৎফুল্ল

নবাগত লোকটী তারপর একটু সরে গেল, জার্মানটী দাঁড়িয়েছিল মৃত্যু পাংশু মুখে, টেবিলের কানায় রাখা আঙুলগুলি তার থর থর করে কাঁপছিল। একটা ছুরি তার বাঁ দিকের পাঁজরে আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। হঠাৎ সর্বশরীর তার কেঁপে উঠলো, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে গেল, তারপর সে দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। বিদ্যুৎ ঝলকের মত রাওল তার কবলমুক্ত হবার পরই পাকশালার মধ্য দিয়ে অন্তর্হিত হলো। অন্য জার্মান পুলিশটী মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপরই সে এগিয়ে এলো গালি দিতে দিতে। আমার পরিচিত লোকটী সরে গেলো তার আক্রমণ এড়াবার উদ্দেশ্যে, টেবিলের ওপর থেকে একটা বোতল নিয়ে সজোরে সে পুলিশটার মাথায় আঘাত করতেই পুলিশটা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে গেল। বোতলটী তারপর টেবিলে নামিয়ে রাখলো সে, রাওলের না-খাওয়া গ্লাসের মদ্য অর্ধেক পান করলো, তারপর একটীও কথা না বলে আমাদের কাফে থেকে বেরিয়ে এলো। রুলার্সে আর কোনোদিন তার দেখা পাই নি।

প্রকাশ্য দিবালোকে জার্মান পুলিশ হত্যার ব্যাপারটা হয়তো অনেক দূর গড়াতো, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তদন্ত শুরু হলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই একবাক্যে এজাহার দিলে যে ব্যাপারটী একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। আর হত্যাকারী লোকটা সকলকে রিভলবার দেখিয়ে নিরস্ত রেখেছিল। দ্বিতীয় পুলিশটী সে সময় অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল বলে প্রতিবাদ করতে পারে নি সে, তাই আমাদের এজাহার সত্য বলেই গৃহীত হয়েছিল।

মে মাসের গোড়ার দিকে একটী সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ বিমান বহর রুলার্সে ভয়াবহ বোমাবর্ষণ করতে লাগলো। কখনো কখনো বা

ব্যক্তিরা ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। ডুবোজাহাজের আশ্রয় দেবার জন্য একটা বিরাট ডক থাকায় ওই নিয়মটা। কাকা কয়েকবার তার জিনিষপত্র সেখানে নিয়ে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাই ডকের মোটামুটি একটা নক্সা এঁকে দিতে পারলেন।

কামান আর সৈন্য এনে এখানকার নৌবাহিনীকে নূতন ভাবে শক্তিশালী করা হচ্ছে জানতে পারলুম। ভাসমান সেতু নির্মানের বহু উপাদান আনা হয়েছে ওখানে। কদিন আগে নাকি .গোড়ালী ভাঙা জুতোপরা আধপেটা-খাওয়া রুশবন্দীদেব দ্বারা ভারী ভারী কামান ধূলিধূসর উঁচু-নিচু পথের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমার কাকা আরো জানালেন তিন মাইল দূরে একজায়গায় একটা কাঠের কেবিন আছে, দূর থেকে মনে হবে যেন দুটো লম্বা গাছের মধ্যে বসানো আছে সেটা। সেই ঘরটার গায়ে জার্মান সমর বিভাগের মোহর রয়েছে। গত বছর থেকে ঘরটা রয়েছে সেখানে দুটো সৈন্য থাকে ওর মধ্যে। লোকেরা ওদের নাম দিয়েছে বুড়ো আর বুড়ি। একা একা ওরা কি যে করে ওখানে সেটা স্থানীয় লোকদের কাছে মস্ত বিস্ময়। মজার কথা হচ্ছে যখন খটখটে রোদ থাকে, তখন 'বুড়িটা' বাইরে বেরোয়। আর যখনই বৃষ্টির প্রতীক্ষায় আকাশ কালো হয়ে ওঠে, তখন বাইবে বেরিয়ে আসে 'বুড়ো'টা।

আমি সেই কাঠের কেবিনে গিয়ে সব কিছু দেখে আসার মনস্থ করলাম। কাকা শুনে প্রথমটা বাধা দিলেন, কিন্তু আমার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখে শেষে অনিচ্ছার সংগেই সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। আমার নারীত্ব সম্পূর্ণ গোপন করার জন্য আহত সৈনিকের ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। কপাল মাথা ও একটী চোখ ব্যাণ্ডেজে ঢেকে দিলাম। তারপর একটা

একঘণ্টা পরে একজন অপরিচিত লোক এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, মাদামোঁয়াজেল ভ্যান আর্ণেব জন্যে চিঠিটা তৈরী আছে কিনা।

লোকটাকে দেখে মনে হলো সে জার্মান, যদিও বেলজিয়ানের অনুকরণ কবার যথাসাধ্য চেষ্টা কবেছে। আমি জানিনা বলতেই সে চলে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই জার্মান এজেণ্ট, আমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। মনটা কিছু দমে গেল। আমার সম্বন্ধে কিছু কি সন্দেহ কবেছে ওরা ?

একটু পবেই আমার বান্ধবী আগ্‌নেস হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালো কিছুক্ষণ আগে জার্মানবা তাদেব বাড়ীব প্রতিটি নবনারীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ কবে গেছে।

আমি অত্যন্ত চঞ্চল হযে উঠলাম। মনকে শুধু সান্ত্বনা দিতে লাগলাম এই কথা ভেবে যে হাসপাতালে যে নূতন মেট্রন এসেছে সে আমাব ওপর হিংসুটেপনা করে হযতো বা আমার সম্বন্ধে কোনো গল্প রটিয়েছে। তবু যখন অল্পকাল পবে নীচের তলায় ভারী বুটের শব্দ শুনতে পেলাম, তখন একান্তভাবেই নার্ভাস হযে পড়লাম। শব্দগুলো ওপবে উঠে আসতে লাগলো বাতাসে কম্পমান ভীতির সঞ্চার করে। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা কবতে লাগলুম।

উদ্যত বেয়নেট নিয়ে দুজন সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখে, তাদের সংগে একজন অফিসার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দু দুবার আপনাদের আসার কারণ জানতে পারি কি ?

সে বল্ল, এখানটা সার্চ করাব হুকুম আমার ওপরে। ফ্রয়লাইন, আপনাদের চাবীগুলো সব দিয়ে দিন, তাহলে সময় আর আপনদের জিনিষপত্র হয়তো নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

চাবিগুলো সমর্পণ করলাম ওর হাতে। মা ও বাবা উভয়েই বাইরে

কিছুই আমার নেই। আমার বাবা-মা রুলার্সে আছেন, আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও কমরেড।

ব্রিটিশ কর্পোরালটীর বাহুবন্দী হয়ে মার্থা চলে এলো রুলার্সে। ব্রিটিশ সৈনিকটী তাকে বলেছিল : যুদ্ধ তো শেষ হলো, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের অনেক কিছু এখন বাকী। নোতুন করে অনেক কিছু গড়ে তুলতে হবে।

দয়ার্দ্র চোখে স্বপ্ন এনে ইংরেজটী বল্লে তারপর : গড়ে তুলতে হবে তোমার ও আমার জীবন।

মার্থা বল্ল, আমি যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি। এখনো কত সময় মনে হয় সত্যি আমি জেগে আছি কি না।

লুডহ্বিগ গ্রেণ

[ইংরেজ লেখক বার্নাড শিউম্যান কাল্পনিক গুপ্তচর কাহিনী লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। ভিয়েনাতে যখন তিনি গুপ্তচর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর সংগে একজন ব্যাভেরিয়ানের আলাপ হয়। সেটা ১৯৩৫ সাল, জার্মানীতে সে সময় নাৎসী শাসনাবস্থা। নাৎসীবিরোধিতার অভিযোগে লোকটী তখন জার্মানী থেকে নির্বাসিত। বার্ণাড নিউম্যানকে একতাড়া পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসে থেকে সে মিত্রশক্তির বিপক্ষে গুপ্তচরের কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। পাণ্ডুলিপিটী তার আত্মকাহিনী। বার্ণাড নিউম্যান আগ্রহে সেটী গ্রহণ করে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

বার্ণাড নিউম্যানের অন্য কাহিনীগুলির মত এটাও কাল্পনিক কিনা বলা শক্ত, তবে নিউম্যানের বিবৃতি মেনে নিলে লুডহ্বিগ গ্রেনের গল্পটীকে সত্য বলেই গ্রহণ করাই উচিত। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে কাহিনীর নায়ক সেই ব্যাভেরীয় লোকটীর নাম গোপন করে সেস্থলে গ্রেনের নাম দেওয়া হয়েছে।]

আমার বাবা ছিলেন ব্যাভেরিয়ার একজন নামকরা আইনজীবী, কয়েকটা বৎসর রাইখষ্ট্যাগে তিনি বসেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁকে কোনোদিনও চোখে দেখিনি, কারণ আমার জন্মাবার কয়েকমাস আগেই তিনি মারা যান। যেমন তাঁর আয় ছিল, তেমনি ছিল তাঁর খরচও। তাই তাঁর মৃত্যুর পর মা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

ফ্রেঞ্চ ক্যানাডার কুইবেক নগরীতে আমার এক মামা থাকতেন—তিনি সেখানে জার্মানীর ভাইস-কন্সাল ছিলেন। আমার বাল্যকালটা সেখানে কেটেছে। পরে মামা শিকাগোতে আসেন। সেখানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাই।

কাছে যথেষ্ট ছিল। আমি জেনেছিলাম সময় নিকটবর্তী। তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। ভিয়েনা নীরব রইলো; ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো হত্যাব্যাপারের কথা যেন ভুলে গেল। আমি অধীর হয়ে উঠতে লাগলাম। আর এই বোধ আমার মনে সর্বদাই জাগ্রত রাখলুম যে চরম মুহূর্তে হাজার হাজার ইংরেজ লুইস গ্রীনের মর্মভেদ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবে—আমি যেন সেই মুহূর্তে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দিই।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠ-কক্ষে অধ্যয়নের অছিলায় আমি ইসলিংটনে বাসা বদল করে নিলাম। ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর পক্ষে যে লোকটী ডাকবাক্স পদ্ধতিতে কাজ চালাচ্ছিল তার সংগে যোগস্থাপনা করার আগে তাকে যাচাই করে নেওয়াই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। লোকটীর নাম কার্ল গুস্তাভ আর্নষ্ট * – ক্যালেডোনিয়ান রোডে নাপিতের দোকান চালায়। জার্মান পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও জন্ম ও বসবাসের জন্য সে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক। জার্মানীর গোয়েন্দা-প্রধান ক্যাপ্টেন ষ্টাইনহাওয়ার ওর ঠিকানার মাধ্যমে লেখালেখির জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমি সেটা একবারও কাজে লাগাইনি। দুতিনবার ওর দোকানে দাড়ী কামাবার ছলে গিয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলুম। বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব ছিল না লোকটার। আমার ধারণা ছিল ক্যাপ্টেন ষ্টাইনহাওয়ার লোকটাকে নির্বাচিত করে ভুল করেছেন, তাই তার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত তার কাছে আমার পরিচয় জানানো যুক্তি-সংগত বোধ করলুম না।

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে ঘটনাবলীর দ্রুত সংঘটন হতে লাগলো। চার তারিখের মধ্যরাত্রে বেলজিয়ম আক্রমণের অভিযোগে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। পরের দিন সকালে আর্নষ্টের

* মাতাহারির কাহিনী দ্রষ্টব্য।

সংবাদ আহরণ করা মোটেই অসুবিধাজনক হবে না। কিন্তু আর্নষ্টের গ্রেপ্তারে আমার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তার গ্রেপ্তার হওয়ার অর্থ আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার বিফলতা। পুলিশ আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আর্নষ্টের যথার্থ স্থান আবিষ্কার করতে পারলে আমাদের প্রত্যেকটী গুপ্তচরই ধরা পড়তে বাধ্য। কার্যত ঘটেছিলও তাই। ওর গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরে সমস্ত গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমি সেটা জানতে পারি কয়েক সপ্তাহ পরে।

যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য ডাক-বাক্স পদ্ধতির সমর্থন আমি কোনোদিন করি নি। আমি ঠিক করলাম আমার নিজস্ব পরিকল্পনার সাহায্যে উল্‌ফ্‌গ্যাংয়ের সংগে আমি অবিলম্বে যোগসূত্র স্থাপন করবো আর কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ব্যবহার করবো না।

৬ই আগষ্ট হোয়াইট হলে বিরাট জনতার লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং অধিক রাত্রে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের রিক্রুটিং ষ্টেশনে হাজির হলাম। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম। সে সময়ে জন্ম সার্টিফিকেটের কোনো দরকার দেখা দেয় নি। আর্মি সার্ভিস কোরে মোটর ড্রাইভার হিসাবে যোগ দিলাম আমি। আমাকে আমাদের ডিভিসনের ডেপুটি অ্যাসিষ্ট্যান্ট কোয়াটার মাষ্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফিগসনের গাড়ী-চালক নিযুক্ত করা হলো।

জার্মান এজেণ্টরূপে আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য ষ্টাফ অফিসারের বিশ্বাস অর্জন, যাতে গাড়ী চালাবার সময় তিনি আমার সংগে কথোপকথনে বিরত না থাকেন বা ছোট খাটো কাজের ভার সম্পূর্ণভাবে আমার ওপরে ছেড়ে দেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফিগসন ছিলেন দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের লোক, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশের ইংরেজদের অপেক্ষা এঁরা কম সন্দিগ্ধমনা।

বিভিন্ন দেশে তার কাজ-কারবার ছিল—কাজের তদারকে সে ঘুরে বেড়াতো সব দেশে। জার্মান গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও সেজন্য বহুকাল সে ধরা পড়ে নি। সে আমাকে ফ্রান্সের কয়েকজন জার্মান এজেণ্টের নাম দিয়েছিল। বেথুনে একজনের ঠিকানা থাকায় আমি অবিলম্বে তার সংগে দেখা করার মনস্থ করলাম।

এজেণ্টটির নাম জুলা রানিন্স্কি। মেয়েটির নাকি একটী ধোবি-খানা আছে। যখন দেখা করতে গেলাম, তখন সে বাড়ী ছিল না। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক আমাকে অন্য একটি ঠিকানায় দেখা করতে বলে দিল।

জুলার খোঁজে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে তাকে আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ হোটেলটি ছিল গণিকালয় আর জুলা সেখানকার মেয়েদেরই একজন।

গণিকালয় সম্বন্ধে ব্রিটিশদের মনোভাব আমাকে সর্বদাই বিস্মিত করতো। পতিতা-বৃত্তির কুফল উপলব্ধি করা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা তা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রচেষ্টা করে নি বল্লেই হয়। বরঞ্চ সোজাসুজি না হলেও গণিকাবৃত্তিকে ওরা পরোক্ষভাবে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে। ব্রিটিশ সৈন্যাঞ্চলে বেথুনের এই হোটেলটী ছাড়া আরো অনেক গণিকালয় ছিল, আর ফ্রণ্ট লাইনের মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত থাকার জন্য সৈন্যরা এখানে দিবারাত্র আসাযাওয়া করতো। হোটেলের সামনে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে দেখেছি বহু সৈন্যকে। সৈন্যবাহিনীতে অবশ্য নূতন নয় দৃশ্যটা।

কাউণ্টারে একজন মেয়েকে দেখলাম। অসম্ভব রং-করা মুখ। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো। আমি বল্লাম, জুলাকে চাই। সে জানালো জুলা এখন ব্যস্ত রয়েছে, অন্য কাউকে চাইলে পাওয়া যেতে পারে। অসম্মতি জানিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম তার জন্য।

নবগঠিত গার্ডস ডিভিশন ও ইংল্যাণ্ড থেকে সদ্য আগত দুটী কিংনার ডিভিশন থাকবে। আমার আশ্চর্য লেগেছিল তীব্র যুদ্ধের মধ্যে এই সব নূতন অনভিজ্ঞদের এনে ঘাগী দলগুলিকে অন্যত্র রাখা হচ্ছে। আমি জানতাম ভারী কামানের ব্যবহারে ব্রিটিশরা হাস্যকরভাবে আনাড়ী কিন্তু জানতে পারলাম ওদের এই দুর্বলতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে ওরা এক ধরণের শ্বাসরোধকারী গ্যাস আবিষ্কার করেছে। আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল ব্রিটিশদের পক্ষ থেকেই প্রথম গ্যাস ব্যবহৃত হবে।

সেপ্টেম্বর ১, তারিখের আগের সপ্তাহে আমি যতগুলি গোপনীয় সমর-তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, তা বোধ হয় যে কোনো গুপ্তচরের সংগ্রহ অপেক্ষা বেশী। আক্রমণে যে দুটো বাহিনী অংশগ্রহণ করবে, তাদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ, গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য, জেনারেল গফ ও রলিনসন নামক দুজন সেনাপতির প্রকৃতি, ব্রিটিশদের সম্ভাব্য গ্যাস-আক্রমণ ইত্যাদি তথ্যগুলি সামরিক দিক থেকে অতি মূল্যবান। আক্রমণের তারিখ আর সময়ও আমি জানতে পেরেছিলাম।

পরপর এতগুলি তথ্যসংগ্রহ করার পর আমি আর একটী দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হলাম। জুলার সংগে দেখা করে জানালাম যে এইবার আমি আমার খবরগুলো নিজে জার্মান লাইনের ওপারে গিয়ে পৌছে দিতে চাই। এ বিষয়ে সে কি করতে পারে? জুলা তার বার্তাবাহকের সংগে সেদিন সন্ধ্যাতেই আমার সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করবে কথা দিল। সেই সন্ধ্যায় কর্ণেল ফিগসনের হেড কোয়ার্টার্সে আমার অন্য কাজ ছিল না। আমি নূ-লা-মাইনসে অবস্থিত একটী বন্ধুকে দেখতে যাবার অছিলায় ফিগসনের গাড়ীটা ব্যবহার করার অনুমতি চাইলাম। কর্ণেল তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। নির্দিষ্ট স্থানে এসে জুলাকে তুলে নিলাম গাড়ীতে। কর্ণেলের একটা পাশ আমি সংগে নিয়ে রেখেছিলাম।

গুপ্তচর। আমাদের মত খনির এই বিস্মৃতপ্রায় পথটী নিজের কাজে লাগাচ্ছে।

লোকটীও নিজের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। অকস্মাৎ বাধা পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে সে কর্তব্য স্থিব করে নিল। ডান হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বার করলো তার রিভলভারটী। আমি কালবিলম্ব না করে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গলাটা চেপে ধরলাম সজোবে। ওর হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল। আমি প্রাণপণে ওর গলাটা ক্রমশ জোবে চেপে ধরে রইলুম যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর দেহের একবিন্দু প্রতিরোধও অবশিষ্ট থাকে।

তারপর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলাম এক সময়। লোকটা পড়ে গেল ধপ্ করে। আমি টর্চ জেলে তার দিকে দেখতে গেলাম। আর বিভীষিকা গ্রস্তের মত চীৎকার করে উঠলাম—লোকটা মারা গেছে!

ভয়েব চোটে মাবা গেছে এমন মানুষের মুখ দেখেছেন আপনারা? কুঁচকে যাওয়া মুখ, দুমড়ানো হাঁ, খোলা চোখ, আর সেই চোখের দৃষ্টি? সেই দৃষ্টি কখনো ভুলতে পাববো না। আজও অসুস্থ শরীরে যখন ঘুম আসে অনেক চেষ্টার পর, হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়ে উঠি। সেই দুঃস্বপ্ন সর্বদাই—সেই ভয়চকিত মুখ, সেই ভীষণ মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি আর তার গলায় আমারই আঙুলের বিষাক্ত ছাপ! একজন ষ্টাফ-অফিসারের মোটর-ড্রাইভার্ হিসাবে বেশী মৃত্যু দেখা আমার কথা নয়, তবু আশেপাশে অনেকগুলো মৃত্যু ঘটতে আমি দেখেছি। আমি দেখেছি গোলার টুকরোয় ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ। এমন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ্ দেখেছি, যাদের মানুষের মৃতদেহ বলে সনাক্ত করা যায় না। তবু সেগুলি বীভৎস হলেও আমার কাছে ত্রাসের সঞ্চার করে নি। কিন্তু আমার হাতে নিহত এই লোকটার মৃতদেহ আমাকে বিভীষিকায় অভিভূত করে দিল।

কোনিনের সাহায্যে মৃতদেহটী গ্যালারীর একটী বাঁকের কাছে এনে আলগা পাথর ও কয়লা দিয়ে বেশ করে ঢেকে দিলাম।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে কর্ণেল ফিগসনের কাছে আরো দক্ষিণে যাবার খবর শুনে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কারণটা যে একমাত্র আমার যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তা নয়, জুলাকে না দেখে থাকাও আমার উদ্বেগের আরেকটা কারণ। জুলার ওপর আমার একটা স্নেহ ধীরে ধীরে জন্মেছিল। সাধারণত ওকে কেউ শিক্ষিত বলবে না, কিন্তু অন্যান্য পোল মেয়েদের মত ইউরোপীয় রাজনীতি ও দর্শনে বিশেষ আগ্রহ-শীলা ছিল সে। দর্শনশাস্ত্রে আমার ব্যুৎপত্তি একটুও ছিল না, তাই ওর বুদ্ধি ও যুক্তি আমাকে বিস্মিত করতো। দেহগত কারণে কখনো ওর প্রেমে পড়ি নি, তবু ওর মুখ আমার ভালো লাগতো। তাই অনেকবার ওকে ওর এই ঘৃণ্য জীবনবৃত্তি ছেড়ে দেবার অনুরোধ করেছি। কিন্তু বরাবরই সে প্রতিবাদ করে বলেছে ওইটাই ওর পক্ষে কাজ করে যাবার সহজতম পথ। আর বাইরে যাই ঘটুক না কেন অন্তরে সে শুচি। কাজ যখন শেষ হবে, তখনই সে গণিকালয় ছেড়ে যাবে। কর্ণেল ফিগসনের কাছ থেকে ঐ খবরটা শোনার পর ওকে জানালাম আমি যেখানেই থাকি না কেন, ও যেন আমার সংগে দেখা করে কোনিনের মারফৎ সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখে।

এক পক্ষকাল পরে আমি আমিয়েঁনে এলাম। ব্রিটিশরা এখানে সোম উপত্যকার উত্তরে একাংশ স্থান দখল করেছে। এর এক হপ্তা পরে আমরা আরো এগিয়ে কোয়েরিউ নামক ছোট্ট গ্রামে এসে হাজির হলাম। আমি জুলাকে বলে দিলাম আমিয়েঁনে এসে থাকার জন্য। এখানে থাকা ওর পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক হবে না। কারণ এ অঞ্চলে ফুর্তিবাজ

যা কিছু স্বার্থ তা ইংল্যাণ্ডেই। আর লড়াই যখন শুরু হয়, তখন আমি ইংল্যাণ্ডের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মনে হলো পাওয়েল আমাকে বিশ্বাস করেছে। মিডোজ করেছে কিনা বুঝতে পারলুম না। তারপর অনেক কথাবার্তা হলো। আমি সতর্কতার সংগে আমার রেজিমেণ্টের নম্বর আর ঠিকানা এড়িয়ে গেলাম। কি জানি, মিডোজ ইচ্ছা করলে আমাকে এখুনি, নয় তো বা পরেও পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে পারে কেবল সন্দেহের বশেই। যাই হোক, পরে একহপ্তার মধ্যে আবার এখানে দেখা হবে আশ্বাস দিয়ে চলে গেল ওরা।

এরপর মিডোজের কথা চিন্তা করে কেবলি মনে অস্বস্তিভোগ করেছি। এর ওপর কোনিনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। তার মুক্তি লাভের পরই একদিন কণ্টিনেণ্টাল ডেলি মেলের পাতা ওল্টাতে গিয়ে 'সাংঘাতিক আহত'দের নামের তালিকায় 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডব্লু. ই. মিডোজ- ফোর্ট গ্যারী হর্স' দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলুম। মিডোজ সাংঘাতিক আহত। তার মানে নিশ্চয়ই তার মৃত্যু ঘটবে। তার অর্থ আমার নিরাপত্তা। ঈশ্বর, যেন তাই করেন।

উলফ্‌গ্যাংয়ের কাছ থেকে বিশেষ একটি বার্তা নিয়ে একদিন একটী ভ্রাম্যমান এজেণ্ট আমাদের সংগে দেখা করবার জন্যে এলো। ব্রিটিশ বাহিনীর লড়াইয়ের নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চেয়েছে উলফ্‌গ্যাং। জুলার ফ্ল্যাটে গিয়ে বার্তাবাহকটীর সংগে দেখা করলাম। বার্তাটী নিয়ে এসেছে একটী তরুণী সুইস মেয়ে—বার্ণে আমাদের গুপ্তচর বিভাগের সংগঠন তাকে দলভুক্ত করেছিল। শুধু সংবাদ বহন তার কাজ। এ কাজে তাকে উপযুক্ত বলেই মনে হলো, কারণ বছরে তিনচারবার সে সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে আসাযাওয়া করে পৈত্রিক ব্যবসা

মাপ আন্দাজ করে নিয়েছিল। তারপর সপ্তাহকাল পরে মেয়েটী যখন এলো, তখন তাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে জুলা তাকে নিকারটা পরে নিতে অনুরোধ করলো।

মেয়েটা ইতস্তত কবছিল। গুপ্তচর বা বার্তাবাহক যাই হোক না কেন, ঘরের মধ্যে আমি থাকায় সে লজ্জা পাচ্ছিল। আমি অগত্যা অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

কিছুদিন পরে আরেকবার মেয়েটী এসেছিল। আমার হাতে তখন কয়েকটা খবর ছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোনো খবর পাঠাতে হবে কিনা, আমি জানালুম, খবব সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, কিন্তু তা পাচাব করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায। মেয়েটী বল্ল, এমব্রয়ডারী পদ্ধতিটা পুবোনো হয়ে গেছে, একটা মেয়ে সেদিন ধরাও পড়েছে এমব্রয়ডাবী শুদ্ধ।

তাহলে কি কবা যায়? আব তুমিও লিখিত বার্তা নিয়ে যেতে নাবাজ।

মেয়েটী একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বল্লে, কত বড় হবে?

বড় হবে বৈকী -- গোটা একটা বিষয় পঞ্চাশ ষাটটা কথায় নামিয়ে আনলেও কতগুলো ফিগার (চিত্র) থাকবে। সব মনে করে বাখাও তোমার পক্ষে কষ্টকব।

সাংকেতিকের সাহায্য নেবেন তো?

নিশ্চয়ই, আমি বল্লাম।

তাহলে প্রস্তুত করুন।

বার্তা তৈরী করার পব জিজ্ঞাসা কবলাম, কীভাবে নিয়ে যাবে বলো দেখি?

মেয়েটী বল্ল, প্রথমে আমাদের কিছু অদৃশ্য কালি দরকার।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম, এই তোমার বুদ্ধি! ফ্রন্টিয়ারে অদৃশ্য কালির পরীক্ষা হয় জানো না বুঝি?

ইংরেজরা হাতিয়ার দেখিয়ে বশ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না। ১১ কিম্বা ১২ তারিখে লড়াই যত কাছে আসবে, ততই চেষ্টা হবে যুদ্ধ-বন্দীদের পিছু সরিয়ে নিয়ে যাবার। এই সময়ে ধর্মঘট বিদ্রোহের সামিল হয়ে ওঠে যেন। রক্ষীদের সংখ্যার জোরে কাবু করে অস্ত্রগুলো কেড়ে নিতে হবে। তারপর সুবিধাজনক স্থানে পরিখা খুঁড়ে তার মধ্যে অবস্থান করে রাইফেল, মেসিনগান ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য হানা দিতে হবে। আশপাশ দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা গেলেই তাদের আক্রমণ করতে হবে।

আমার এই কথাগুলোকে যেন জার্মান সম্রাটের নির্দেশ বলে মেনে নেয় ওরা।

ইংরেজরা এই সময়টা অত্যন্ত পরিশ্রমের সংগে যুদ্ধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল। ফরাসীদের বছরের পর বছর ধরে ঔদাসিন্য ও অবহেলার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করছিল ওরা। আমি জেনেছিলাম আমাদের চল্লিশটী ডিভিশন এবারের আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সে জায়গায় ওদের ফিফ্‌থ আর্মিতে মাত্র চোদ্দটী ডিভিশন রয়েছে।

একটা মোটর-সাইকেল চেয়ে নিয়ে আমি প্রায়ই যুদ্ধ-বন্দীদের কোম্পানীগুলি পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলুম সুযোগমত। তৃতীয় সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগেও আমার কর্মতৎপরতা বেড়ে গেল। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বস্ত এজেন্টের অভাববোধ করতে লাগলুম—কয়েকজন জার্মান অফিসার, বন্দীদের কোম্পানীর মধ্যে যাদের ঢুকিয়ে দিলে অনেক সুবিধা হতো।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো একদিন একজন লোক—বাহ্যত একজন ফরাসী সাংবাদিক—এসে আমাকে জানালো আক্রমণ স্থগিত রাখা হয়েছে ২১ তারিখ পর্যন্ত। এর অর্থ আমার সমস্ত পরিকল্পনার

রিজার্ভস্ আছে। দেখতে পেলাম দুটো ক্যাভাল্‌রি রেজিমেণ্ট যাচ্ছে। একজন অফিসার কৌতূহলী হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে :

—এরা কে, কর্পোরাল ? সদ্য বন্দীর দল ?

—না স্যর, যুদ্ধ-বন্দীদের লেবার কোম্পানী।

—একটু বেশীই অগ্রসর হয়েছো, তাই না ?

—কি করা যাবে এসময়ে ! গ্রীন লাইনে যথাসময়ে এদের নিয়ে পৌঁছতে পারলে কাজ করবে ওরা সেখানে।

বিকালে আমাদের রসদ জুটে গেল। আমাদের নজরে পড়লো একটা আর্মি সার্ভিস কোর জি. এস. ওয়াগন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, ঘোড়াগুলিও মরে পড়ে আছে ! শুধু শুয়োরের মাংস আর বিন্ ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না, তাই দিয়ে আমরা খেয়ে মিলাম সবাই।

এখন আমরা রণ-স্থলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ক্রোজাট খালের ওপর দিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করলুম আমরা। ক্রিগ্‌নির চৌমাথার কাছে বন্দুক সাজিয়ে রাখলাম। রাস্তার ওদিক থেকে ৪০।৫০ জনের একটা দল এসে হাজির হলো—আমরা তৈরী ছিলাম, অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সকলেই নিহত হলো। রণাংগণের খুব নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মৃতদেহগুলি লুকোবার আর কোনো প্রয়োজন বোধ করলুম না। আমরা রাইফেল, বারুদ আর লুইস গানগুলি সংগ্রহ করে দক্ষিণ পূর্ব দিকে রওনা দিলাম।

একটা বনের ধারে গোলন্দাজদের একটী ব্যাটারী রয়েছে। পরিখার মধ্যে আমার অধীনে এখন ব্রিটিশ উর্দি বা গ্রেট কোট পরিহিত সশস্ত্র প্রায় একশো জন লোক রয়েছে। ব্যাটারীর কাছে এসে আমরা অতর্কিত আক্রমণ করে গোলন্দাজদের গুলি করে মারলাম। নিঃসন্দেহে একটা

হত্যা-লীলা সংঘটিত হলো। জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ আমরা এখানে এক ডজন রাইফেল ও কিছু পরিমাণ খাদ্য পেলাম।

ম্যাপ অনুযায়ী ক্রোজাট খালের দক্ষিণ পারে জুসি গ্রামের দুমাইল দক্ষিণ পূর্বদিকে একটা ছোট্ট জংগল আছে। এখানে এসে প্রত্যেকটী লোককে জার্মান পোষাক পরে নিতে বল্লাম। সত্যিকার রণস্থল এখানে, এখানে মৃত্যু বরণ যদি করতেই হয় তো সৈনিকের মতই করবো আমরা, গুপ্তচরবৃত্তে নয়।

এই বনের পূব দিকে এসে আমরা দেখতে পেলাম একটা হাউই জার ব্যাটারী পিছন থেকে আক্রমণ আক্রান্ত হতেই ওরা হতভম্ব হয়ে গেল, দু একজন পালিয়ে গেল, বাকা সকলে আমাদের হাতে নিহত হলো। একটী মৃত সৈনিকের কাছ থেকে পাওয়া দূরবীনের সাহায্যে আমি দেখলাম সামান্য সংখ্যক বৃটিশ সৈনিক জুসি অধিকার করে রয়েছে। জুসির ওপর গোলা চালাবার হুকুম দিলাম। আর সংগে সংগে উত্তরে ও দক্ষিণ-পূবে জুসিক্যগ্‌নি ও জুসি চ্যায়নি পথের ওপর পাহারার নির্দেশ দিলাম। সেদিকে বৃটিশ সৈন্যদের সংগে আমাদের দলের সংঘর্ষ হলো এবং আকস্মিক আক্রমণের জন্য ওরা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো। আরো অনেকগুলো রাইফেল, গোলা এবং তিনটী মূল্যবান মেশিনগান পুরস্কার পেলাম।

এদিককার টিলা ও জুসি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ আমার দখলে। সম্মুখের প্রসারিত রেলপথের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করতেই দৃষ্টি গোচর হলো একদল সৈন্য আমাদের দিকে আসছে। আমি অবিলম্বে অগ্নি-বর্ষণের হুকুম দিলাম। ইংরেজরাও গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু আমাদের সঠিক অবস্থিতি ঠাহর করতে না পারার জন্য সফল হলো না ওরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে লড়াই চল্ল, বোঝা গেল গোলাগুলির অভাব রয়েছে ওদের।

করবার। তাই বিশ্বাসের অযোগ্য সৈন্যদলগুলিকে অপসারণ করাই সাব্যস্ত হয়েছে। ব্রিটিশ আর্মি কম্যাণ্ডার হর্ন অদ্ভুত নিয়মে সৈন্য সরিয়ে নিচ্ছেন। প্রথমে একটা ডিভিশন সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনের ওপর ভার দেওয়া হচ্ছে গোটা ফ্রন্টের দায়িত্ব। ৬ই এপ্রিল আমি জানতে পারি: ৯ তারিখের রাত্রে ডিভিশন সরানো হবে। এর আগে আক্রান্ত হলে তা সোজাসুজি ভেঙে পড়বারই সম্ভাবনা।

বেথুনের সেই হোটেলে কাউন্টারের মেয়েটা আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলো। আজকাল ব্যবসা মন্দা চল্‌ছে—বেথুন আর আগেকার মত ফ্রন্টের পেছনে সেই শান্তিময় অঞ্চল নয়। যখন তখন বোমা পড়ে এখানকার খুব ক্ষতি হয়েছে, অনেক লোকও মারা পড়েছে। মেলাই সৈন্য এখানে থাকলেও মেয়েরা আর থাকতে রাজী হয় না। জুলাকে আসতে দেখে মেয়েটা খুশীই হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক ধরে জুলা ও আমি বসে বসে শুধু নখ চিবোতে লাগলুম। ফ্রন্টের খবরটা কি উপায়ে পাঠানো যায় ভাবছিলুম আমরা। সাধারণ চিঠির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বার্তা আজকাল প্রায়ই ধরা পড়ছে। এমব্রয়ডারী সংগীত এসব পদ্ধতি এখন বহু ব্যবহৃত সেন্সর কর্তারা এগুলোর প্রতি সর্বাগ্রে নজর দিচ্ছে। কোনিন? না, সে এনেকিউন ছেড়ে গেছে। ২নং খনি ব্রিটিশরা বন্ধ করে দিয়েছে। অবশেষে উপায় হলো একটা—জুলা প্যারীর ট্রেনে চলে গেল। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডে তার 'মাসী'র কাছে টেলিগ্রাম পাঠালো: জর্জ ৯ তারিখের রাত্রে যাত্রা করবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারো?

জার্মানরা ৯ তারিখের রাত্রে পোর্তুগীজ ফ্রন্টে আক্রমণ চালিয়ে ওদের ছত্রভংগ করে দিয়েছিল। আমার পাঠানো খবরের ফলেই জার্মানরা সেদিন বিজয় লাভ করেছে—এই গর্ব আমার মনে ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে

ঠিক। কর্পোরাল গ্রেন নামে কোনো মোটর ড্রাইভারের সংগে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ?

আমি জবাব দিলুম, না, তার কথা আগে শুনি নি।

লালটুপি বলতে লাগলো, প্রায় ৫ ফিট ১০; বয়স ২৬য়ের কাছাকাছি। মজবুত গড়ন চেহারা, কটা চুল। নীল চোখ। জার্মান ভাষা অনর্গল বলতে পারে।

আমি বল্লাম, বর্ণনাগুলো অনেকের সংগেই মিলে যাবে—আমার সংগেও মিলতে পারে, শুধু যা আমি জার্মান জানি না।

ও! একটা কূট মতলব খেলে গেলো তার মাথায়: **sprackens zie deutsch ?**

জ্বরের তাড়নায় আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমিও জার্মান ভাষায় জবাব দিলাম, **Bon soir qui mal y pense.**

সার্জেন্ট নিকলস্ বল্লে, আমি হতাশ হলুম না, কারণ কোনো আশা নিয়েও আমি আসি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি ?

সে সহজ গলায় বল্লে, সন্দেহ হচ্ছে এই গ্রেন লোকটা জার্মানীর গুপ্তচর। ওর নামটা রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ১৯১৬ সালে ওকে দেখা গেছে আমিয়েঁনে.। ফ্রান্সের সমস্ত আর্মি সার্ভিস কোর-ওয়ালাদের মধ্যে সন্ধান করলে ও ধরা পড়বে নিশ্চয়ই। তাছাড়া দুজন ক্যানেডিয়ান অফিসার ওকে দেখামাত্রই চিনতে পারবে। সুতরাং—

কোনো সংশয় আর রইলো না আমার। অসম্ভব রকম ভীত হয়ে পড়ছি আমি। সেই ৪৮ ঘণ্টার বীরত্বপূর্ণ অভিযানের পর কেন আমি চলে গেলাম না ফ্রন্টের ওপারে ? উলফ্‌গ্যাং জানিয়েছিল ওই ঘটনার পুরস্কার স্বরূপ আমার গুপ্তচর হিসাবে আর কাজ না করলেও

ভালো কথা; তবে সেদিন কোথায় ছিলে ?

জবাবটা আমি দিতে পারলুম না। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম আমি যেন নিজের জীবনের জন্য যুদ্ধ করতে শুরু করেছি।

ইন্সপেক্টর ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, আমি কোনো জবাব না দিয়ে শুধু একটীমাত্র দাবী তুলছিলাম : আমেরিকান কন্‌সালকে চাই। ১৯১৬ সালে, তখনকার দিনে, ফ্রান্সে আমেরিকার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

আমেরিকার দূতাবাস থেকে বিকেলে একজন এলেন, ধীর বিজ্ঞজনোচিত চেহারা। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমেরিকার নাগরিক ?

হ্যাঁ, আপনি এসেছেন বলে আনন্দিত।

নাম কি তোমার ?

আমি শিকাগো শহরের উল্লেখ করে আমার পাশপোর্টে উল্লিখিত নামটাই বল্লাম, পিতার নামও বল্লাম। বলা বাহুল্য, যে নাম আমার নিজের বলে চালাচ্ছি, সেটা সত্যিকার একজন আমেরিকানের নাম, তার পিতা একজন সেনেটর।

ভদ্রলোক বল্লেন, তোমার পিতাকে আমি জানি। কিন্তু তুমি যে তাঁর ছেলে সেটা ঠিকতো ?

তা নয় তো কি ? আর কি হতে পারি ?

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বল্লেন, জানি না। তবে ছেলেটী ছয় সপ্তাহ আগে লড়াইতে মারা গেছে !

হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মিথ্যা পরিচয় নিঃসন্দেহে আমাকে নির্বোধ প্রমাণিত করেছে। ভদ্রলোক বল্লেন, তোমার কথা শুনে আজ সকালে ওর রেজিমেণ্টের কর্ণেলের সংগে দেখা করে খোঁজ নিয়েছিলাম। এবিষয়ে কোনো ভুলই নেই যে সে মারা গেছে আর তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

অতএব, আমার সাহায্য যদি তোমাকে নিতেই হয় তো সোজা সত্য কথা বলো।

অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের জন্য ধিক্কার দিলাম নিজেকে। তবু সাহসের সংগে আমি শিকাগো শহর, সেখানকার সুপরিচিত ব্যক্তিদের নামধাম ইত্যাদি বর্ণনা করতে লাগলুম। ইউনিভার্সিটি ও প্রফেসরদের সম্বন্ধে, সেখানকার পথঘাট ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি বলতে লাগলাম।

রাষ্ট্রদূত জবাব দিলেন, এতে প্রমাণ হচ্ছে শিকাগো তোমার পরিচিত। কিন্তু তুমি যে আমেরিকার নাগরিক তা প্রমাণ হয় না।

আমি বল্লাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি ?

গত জুন মাসে একজন লোক ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডে এসে সেখানকার কেমিষ্টের সংগে আলাপ জমিয়ে পাওয়ার-হাউসে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিল।

আমি বিস্মিত হয়ে বল্লাম, তার সংগে আমার কোনো সংস্রব নেই। সেখানে আমি কখনো যাই নি।

সেটা প্রমাণ করতে পারলে ভালোই। তাছাড়া তোমার পাশপোর্টের ব্যাপারটা রয়েছে। ওটা —'র পাশপোর্ট নয়। তা ছাড়া সে ছিল সৈনিক, পাশপোর্টের দরকারই ছিল না তার। আর এখন সে মৃত। আরো একটা অভিযোগ হচ্ছে পাশপোর্টটা আদৌ আমেরিকান নয়। ওটা জাল ছাড়পত্র।

জাল !

হ্যাঁ, তোমার পাশপোর্টে আমেরিকান ঈগলের নখের থাবা! ভুল দিকে বাঁকানো আর লেজে দুটো পালক কম।

পরের দিন একটা লোক আমাকে সনাক্ত করে গেল এই মর্মে যে ক্লারমণ্ট ফেরাণ্ডের নাশকতা কার্যের অপরাধী ব্যক্তি আমিই। আমি

ইন্সপেক্টর সাক্ষ্য দিলেন। আমি অবাক হলাম ইংরেজ পুলিশদের কর্মতৎপরতায়। তিনি আমার ইংল্যাণ্ডে আসা, ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা, স্থানীয় সমস্ত ব্যাপারে অংশ নেওয়ার কথা খুটিনাটি বলে জানালেন আমি ব্রিটিশ নাগরিক-সত্ত্ব অর্জন করিনি।

প্রেসিডেণ্টের জেরার উত্তরে আমি বল্লাম, সাক্ষ্যপ্রমাণাদিতে দেখা যাচ্ছে আমি জার্মান নাগরিক। সেটা অস্বীকার করবো না, তবে লড়াই না বাধলে জার্মান নাগরিক অধিকার ত্যাগ করে আমি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করবার চেষ্টা করতুম। লড়াই শুরু হলে উপায়ান্তর না দেখে আমি ব্রিটিশ সেনাদলে যোগ দিলাম এই আশায় যে এর ফলে হয়তো বা আমি ব্রিটিশ প্রজারূপে পরিগণিত হবো। আমি ভুল করেছি এখন বুঝতে পারছি।

কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে থাকি, ব্রিটিশদের বিজ্ঞপ্তি দেখে আমি খুব ভীত হয়ে পড়ি। আমার মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নেওয়া হবে। তাই প্যারী চলে এসে গা ঢাকা দিই। সেখানে মদের আড্ডায় একজন লোক আমাকে বাহিনী-ত্যাগী ভেবে আমার জন্য পাশপোর্ট জোগাড় করে দেবে বলে। আমি রাজী হয়ে যাই। সে আমাকে অর্থের বিনিময়ে একটা পাশপোর্ট এনে দেয়, তাই নিয়ে আমি সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করি। পরের ঘটনা আপনারা জানেন। আমি ভুল করে অন্যায় করেছি, কিন্তু তা হলেও প্রমাণ হয় না জার্মানীর পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করেছি।

এরপর একজন ইংরেজ সাক্ষীকে আনা হলো। লোকটা প্রথমে ফোর্থ আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের পোষ্ট-অফিসের কর্পোরাল ছিল, পরে তাকে ফিফ্‌থ আর্মির সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। ওর ভাই জার্মানীতে বন্দী থাকায় সে আমার জার্মানীস্থিত যুদ্ধবন্দী বন্ধুর চিঠিপত্রাদি সম্বন্ধে বিশেষ

•নার্স এডিথ ক্যাভেল

পাঁচ বৎসর সেই পদে যোগ্যতার সংগে কাজ করেছিল। কাজে যোগ দেবার দু বছর পরে মেডষ্টোনে টাইফয়েডের প্রকোপ ক্রমশ বেড়ে উঠে মহামারীর সৃষ্টি করে—কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তা দমন করতে পারছিলেন না। তাঁরা সাহায্যের আবেদন করলে লণ্ডন হাসপাতাল এডিথ ক্যাভেলের নেতৃত্বে একদল শুশ্রূষাকারিণী প্রেরণ করেন। ক্যাভেলের স্বাধীনভাবে কাজ করার এইটাই প্রথম সুযোগ। এই কাজে এডিথ সাফল্য লাভ করে লণ্ডন হাসপাতাল থেকে পুরস্কৃত হয়। কয়েক বছর পরে এডিথ শেরডিচ ও হাইগেটে নার্সিংয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তেই সে সুইজারল্যাণ্ডে ও ইতালিতে এসে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে ম্যানচেষ্টারের এক নার্সারীতে সাময়িকভাবে যোগদান করে। এই সময় বেলজিয়ামের সামরিক হাসপাতাল সমূহের কর্তা তাকে বেলজিয়ান নার্সদের উন্নততর শিক্ষাদানের ব্যাপারে তার সহায়তা চাইলে ১৯০৬ সালে এডিথ ব্রুসেল্‌স্ যাত্রা করে। এরপর আর কোনোদিন সে মাতৃভূমিতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য আসে নি।

ব্রুসেল্‌সে এডিথ ক্যাভেলের কার্যাবলী সাফল্য লাভ করেছিল। সামরিক হাসপাতালের কর্তা ডাঃ দিপাজের নিজস্ব বারকেনদাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট নামক ক্লিনিকের প্রথম মেট্রনের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল এডিথের ওপর। এই ক্লিনিকটী পরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধের ঠিক আগে বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নূতন ও বৃহত্তর অট্টালিকায় স্থানান্তরিত করার জন্য রাজকীয় ভাণ্ডার থেকে তহবিল সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সেই সময় এডিথ নিজেও ব্রুসেল্‌সে সেণ্ট গিল্‌সের হাসপাতাল ও নার্সদের শিক্ষার জন্য একটী ইস্কুল নিজস্বভাবে সংগঠিত করছিল। এই সময় থেকেই নার্সিং সমস্যার বিষয়ে এডিথ ক্যাভেল একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে।

লণ্ডনের আন্তর্জাতিক নার্সিং কংগ্রেসে এসে বক্তৃতাও করে যায়। জার্মানরা ১৯১৪ সালে বেলজিয়াম আক্রমণ করলেও এডিথ ক্যাভেলের মহত্ত্বের কথা তারা জানতো বলে বারকেনদাল ইনষ্টিটিউট এডিথের হাতেই রেখে এটীকে সর্বজাতির আহতদের চিকিৎসার্থ একটী রেডক্রশ হাস-পাতালরূপে গড়ে তুলতে অনুরোধ করেছিল।

এডিথ ক্যাভেলের চরম সাফল্য দেখা গিয়েছিল বেলজিয়ান নার্সিং রীতির পরিবর্তনের কাজে। ব্রুসেল্‌সে ওর আসার আগে বেলজিয়মে যারা নার্সের কাজ করতো, তারা সবই প্রায় গীর্জা থেকে আসতো—নার্সদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিল বেলজিয়মের রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের কর্তব্যের প্রেরণা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ না করা গেলেও, এটুকু বলা যায় সেই সব মেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞান এমন ছিল না যাতে স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ (পীড়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যেটা অপরিহার্য) তাদের বুঝানো যেত, আর দারিদ্র্যের জন্য তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বা হাসপাতালের কাজের উপযোগী ছিল না। এডিথ ক্যাভেল প্রথমেই তাদের পোষাক পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়ে উঠলো। এর আগে পর্যন্ত বেলজিয়মে নার্সিং বৃত্তি ক্যাথলিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রটেষ্ট্যাণ্টদের সেবাবৃত্তি গ্রহণ করার উপায় ছিল না। সেখানে শুধু এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে কেবলমাত্র মঠের সন্ন্যাসী মেয়েরা কিম্বা অতি দরিদ্র রমণীরাই এবৃত্তি গ্রহণের অধিকারী। এডিথ ক্যাভেল জনসাধারণের এই অজ্ঞ মনোভাবও দূর করতে এগিয়ে এল। সে সর্ব সম্প্রদায় ও সর্বজাতির মধ্যে থেকেই মেয়েদের গ্রহণ করে অতি দ্রুত এক নার্সদল তৈরী করে ফেল্ল।

এডিথ ক্যাভেলের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এই পর্যন্ত এসেও কোনো-রূপ আলোকপাত করতে পারা যায় না। কারণ যে জীবন তার নির্বাচিত পথের লক্ষ্য সন্ধানে শান্ত ও অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দে অগ্রসর হয়, তারপর

জীবনের পথ সর্বদাই ছিল কণ্টকিত ও সমস্যাসংকুল। অবকাশের এই ক্ষণটীকে আমি অভ্যর্থনা করে নিয়েছি আনন্দে। আমার প্রতি সকলের ব্যবহারই ছিল সুন্দর। বিধাতা ও অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন আমি উপলব্ধি করি স্বদেশপ্রেমিকতাই যথেষ্ট নয়। কারুর প্রতিই আমি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করি না।

এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুর সংবাদ মিত্র দেশগুলিতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য একথা ঠিকই যে এ ব্যাপারে মিত্র সংবাদপত্রগুলির পক্ষে জার্মান-বিরোধী প্রচারকার্যের নতুন করে সুবিধা হয়। জনসাধারণ এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুতে গভীর শোকাভিভূত হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সেণ্ট পলের গীর্জায় উপাসনা হয়েছিল। তার মৃত্যুর খবর যথেষ্ট প্রচারিত হবার পর লণ্ডনের রিক্রুটিং অফিসগুলি দিনের পর দিন ধরে জনাকীর্ণ হয়ে উঠে। এডিথ ক্যাভেলেব মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণ দলে দলে সৈন্যদলে যোগদান করবার জন্য এগিয়ে আসে। সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এই দিকটা বিচার করলে মনে হয় এডিথ ক্যাভেলের হত্যা বিধান জার্মান কর্তৃপক্ষের পক্ষে ভুল হয়েছিল।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এডিথ ক্যাভেলের মৃত্যুদণ্ড হলেও জার্মান গভর্ণমেণ্ট শুধুমাত্র মিত্রপক্ষের সৈন্যদের পলায়নে সহায়তা করা ছাড়া এডিথ ক্যাভেলের বিরুদ্ধে অন্য কোনো কার্যকলাপের অভিযোগ করেনি। এডিথ ক্যাভেল সামরিক গোপন তথ্যাদি লুণ্ঠন করে মিত্রপক্ষকে জানাবার কোনো চেষ্টা করে নি। ক্যাভেল সত্যিই এমন কিছু করে নি যা সাধারণ মানুষের পক্ষে লজ্জাকর। শান্তির সময়ে বা সামরিক কালে তার দ্বারা যেটুকু সম্ভব হয়েছিল তা মানবিক দিক থেকে মহত্তর। এডিথ ক্যাভেল কার্যত সৈনিকের মৃত্যুবরণ করেছে।

• ব্রিটেনে জার্মান গুপ্তচর

কার্ল হান্‌স লোদি

এণ্টন কুপফার্ল

পিটার হান্‌ এবং ম্যুলের

কনরাড লেএটার

ব্যারন অটো ফন গুম্পেনবার্গ

জ্যানসেন এবং উইলিয়ম জোহানেস রুস

জর্জ টি. ব্রিকাউ এবং লিজি হ্বারথেম্‌

ফার্নাণ্ডো বুসম্যান

লোদি সে জায়গায় নিজের একটি ফটোগ্রাফ এঁটে দিয়েছিল। ইংলিশ বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে লোদি এডিনবরার নর্থ ব্রিটিশ ষ্টেশন হোটেলে এসে উপস্থিত হয়, সেখান থেকে ষ্টকহোমের এ্যাডল্‌ফ বুরচার্ডের নামে এক টেলিগ্রাম পাঠায়। সেন্সর কর্তৃপক্ষ টেলিগ্রামটি সন্দেহজনক মনে করে গোপনে লোদির ওপর নজর রাখতে শুরু করেন। লোদি হোটেলে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে একটা বাড়ী ভাড়া নেয়। তারপর এডিনবরা থেকে চলে আসে লণ্ডনে। বিমানাক্রমণ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে খুব আগ্রহ দেখায়। দুদিন পরে আবার যায় এডিনবরায়। সেখান থেকে লিভারপুলে। সেখানে জাহাজগুলোকে ক্রুজারে রূপান্তরিত করা হচ্ছিল। আরো কিছুদিন ইতস্তত ঘোরাঘুরির পর লোদি যায় আয়র্লণ্ডে। এখানে তাকে পুলিশ সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করে—লোদি এতে ঘাবড়ে যায়। ডাবলিনের গ্রেসাম হোটেল থেকে সে তার এক সুইডিশ বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালো সে নার্ভাস বোধ করছে। লোদির লেখা চিঠিপত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—সাধারণ কালিতে ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় বিশেষ কোনোরূপ লুকোচুরির আশ্রয় না নিয়ে বরাবর চিঠি লিখতো সে। অবশ্য যেসব সংবাদ সে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল, সেগুলি বিশেষ মূল্যবান ছিল না। তার কোনো চিঠিই জার্মানীতে পৌছাতে দেওয়া হয় নি, শুধু ইংল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে রুশ সৈন্যদের চলাচলের খবরটুকু ছাড়া।

ডাবলিন থেকে লোদি কুইন্সটাউন যাবার পথে কিলারনিতে এসে পৌছলে ২রা অক্টোবর রয়াল আইরিশ কন্‌ষ্টেবুলারী তাকে আটক করে রাখে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে গোয়েন্দাদের না আসা অবধি। ওর জিনিষ পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় চুরি করা পাশপোর্টটা, কিছু সোনা আর বিলিতি নোটে মিলিয়ে প্রায় পৌনে দুশ পাউণ্ডের মত, কয়েক সপ্তাহ আগেকার উত্তর সমুদ্রের নৌযুদ্ধের বিবরণ, বার্লিন, ষ্টকহোম, বার্জেন ও হামবুর্গের

না, আমি গ্রহণ করলাম সৈনিকের মৃত্যু। ...সলিঞ্জেন, রাসটাটে আমার খুড়ো এমব্রোস ব্রোলকে অনুগ্রহ করে সংবাদ দেবেন। আমার সমস্ত সম্পত্তি উনিই পাবেন।

যা করেছি সবই স্বদেশভূমির জন্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আপনাদের এণ্টন কুপফার্ল..'

প্লেটের উল্টো পিঠে লেখা ছিল :

আমার বয়স ৩১, জন্ম ১১ই জুন, ১৮৮৩।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের গোড়া থেকেই জার্মানরা শত্রুর দেশগুলিতে দলে দলে গুপ্তচর পাঠাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল; এই বিষয়ে হল্যাণ্ড হয়ে উঠেছিল তাদেব মস্ত বড় ঘাঁটি। গুপ্তচর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হল্যাণ্ডে জার্মানরা অসংখ্য অফিস স্থাপন করেছিল। সাধারণের চোখে ধুলো দেবার জন্য অফিসগুলোকে সাজানো হতো ঠিক সওদাগরী অফিসের মত। অফিসে ঢুকতে প্রথমে চোখে পড়তো শো-কেসে সাজানো সস্তাদরের চুরুট ও অন্যান্য দ্রব্যের কিছু কিছু নমুনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যিকার কয়েকটা ব্যবসায়ী কোম্পানী (যাদের অস্তিত্ব কোনোক্রমে টিকে থাকার মতো ছিল) জেনেশুনেই আর্থিক লাভের আশায় তাদের অফিস ভাড়া দিয়েছিল। হল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় জার্মান গোয়েন্দাদের এই রকমের অনেক অফিস ইতস্তত গজিয়ে উঠেছিল।

ইংল্যাণ্ড থেকে বহু চিঠিপত্র হল্যাণ্ডের ঐসব ঠিকানার উদ্দেশ্যে ছাড়া হতো। সেন্সর কর্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ এইসব চিঠি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। অনেক চিঠি আবার অদৃশ্য কালিতেও লেখা থাকতো। প্রথমটা অসুবিধা হয়েছিল প্রেরকের ঠিকানা নির্ণয় করা, কারণ চিঠিগুলিতে কোনো ঠিকানা থাকতো না, উপরন্তু চিঠিগুলি লণ্ডনের বিভিন্ন ডাকঘর

ধৈর্যের সংগে ঐ একই প্রশ্ন ক্রমাগত করা হচ্ছিল। অবশেষে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সত্য গোপন করে রাখার সামর্থ্য হারিয়ে ফেল্ল। চীৎকার করে বল্লে, স্পেনে কিজন্যে যাচ্ছি জানতে চান? মাদ্রিদের জার্মান রাষ্ট্রদূত প্রিন্স র‍্যাটিবুরের হাতে একটি গোপন দলিল পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুলিশ পুনরায় প্রশ্ন করলো, দলিলটা কোথায়?

আমার কেবিনের লাইফবেল্টের ভেতর সেলাই করে দেওয়া আছে।

এইরকমে বহু গুপ্তচর যথাস্থানে পৌঁছবার পূর্বে জাহাজ থেকে ধৃত হয়েছিল। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ গোয়েন্দা-পুলিশ সফল হয়েছিল। ১৯১৫ সালের অক্টোববে ভূমধ্যসাগরের এক জাহাজে যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বোর্ডিং অফিসার জাল ছাড়পত্রসহ এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। ইজিপ্টে তাকে আটক করে তদন্ত চালানো হয়েছিল। জাল ছাড়পত্র ছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। লোকটীর দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন এক ব্রিটিশ অফিসার সেখানে অন্য কাজে উপস্থিত হয়েছিলেন, লোকটীকে দেখে তার পিঠ চাপড়ে তিনি বলে উঠেন, হ্যাল্লো, গুম্পেনবার্গ। লোকটা তার পরিচিত ব্যক্তির সামনে একেবারে নার্ভাস হয়ে যায়। একে একে সব কথাই প্রকাশ হয়ে যায় তার মুখ থেকে।

লোকটী জার্মানীর ডেথস্ হেড হুসার বাহিনীর একজন স্কোয়াড্রন অফিসার, নাম ব্যারন অটো ফন গুম্পেনবার্গ। ইতিপূর্বে কোন এক কেলেংকারিতে জড়িত থাকার ফলে তাকে সাত বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। মুক্তির পর নানাস্থানে চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিল। কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপলে এনভার পাশার এডিকংরূপে কিছুদিন কাজ করেছিল!

হলে সে তার কোন সদুত্তরই দিতে পারেনি। শুধু সে ইংরেজী বলতে পারতো ও চাকুরীপ্রার্থী ছিল বলেই নাকি। রুসকে সে চেনে না। অথচ রুস ও ডায়ার্কস এণ্ড কোং'র প্রতিনিধি বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। জ্যানসেনের সম্মুখে তাকে হাজির করা হলে রুস ওকে চেনে বলে স্বীকার করলো।

এরা যে পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণ করতো তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। টেলিগ্রামে সিগারের অর্ডার যদি এইভাবে থাকতো : ১০,০০০ ক্যাবানা, ৪,০০০ রথসচাইল্ডস, ৩,০০০ করোনা ইত্যাদি, তাহলে আসল অর্থ করা হতো পোতাশ্রয়ে ১০টী ডেষ্ট্রয়ার, ৪টী ক্রুজার আর আর ৩টী যুদ্ধ-জাহাজ অবস্থান করছে।

বিচারকের রায়ে লণ্ডনের টাওয়ারে এদের গুলি করা হয়। জ্যান-সেনকে প্রথমে যখন গুলি করা হয়, রুস তখন ধূমপান করছিল। ধূমপান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে। কিছুক্ষণ পরে সে সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিস্পৃহভাবে চেয়ারে বসে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। সেই সময় তার মুখে এই ভাবটাই ফুটে উঠেছিল যে সিগারেটটা শেষ হওয়ার সংগে তার ঐহিক সব কিছুই যেন শেষ হয়ে গেছে।

১৯১৫ সালের মে ও জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে একপক্ষ কালের মধ্যে সাত জন গুপ্তচর ধৃত হয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রেজিন্যাল্ড রোল্যান্ড (আসল নাম জর্জ্জ টি, ব্রিকাউ) এবং মিসেস লিজি হ্বারথেম্।

ষ্টেটিনের এক পিয়ানো-নির্মাতার ছেলে ব্রিকাউ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতো। ভালোরকম ইংরাজীও বলতে পারতো। ইংল্যাণ্ডে নিজেকে ধনী আমেরিকান বলে পরিচয় দিত। স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে আর্নষ্ট ওয়ালডেমার মেলিন নামে ৫০।৬০ বছর বয়সের এক সুশিক্ষিত সুইডিশ ভদ্রলোক এসেছিলেন। এককালে তিনি গোটেনবার্গের কোনো জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় পৃথিবী পর্যটন শুরু করেন। মাঝে মাঝে লণ্ডন, প্যারী, কোপেন-হেগেনে চাকরী করেন। লড়াই যখন শুরু হয় তখন তিনি হামবুর্গে। তখন কোনো চাকরী ছিল না তাঁর। এণ্টোয়ার্পে কাজ পাওয়া যেতে পারে শুনে তিনি সেখানে যান। জার্মান গুপ্তচর সংগ্রাহকরা তখন সেখানে ইংরেজী ভাষাভাষী লোকের সন্ধান করছিল। মেলিনকে আবিষ্কার করতে তাদের দেরী হলো না। প্রথমটা তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কপর্দকশূন্য অবস্থায় বেশীদিন তাঁর পক্ষে অর্থলোভ সম্বরণ করে থাকা সম্ভবপর হয়নি। হেবসেল ও এণ্টোয়ার্পে শিক্ষা সমাপ্তির পর রটারডামে তাঁকে পাশপোর্ট ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা দেওয়া হয়। এরপর তিনি হ্যাম্পষ্টেডের এক বোর্ডিং হাউসে এসে ওঠেন। পরিচয় দেন ডাচ-ব্যবসায়ীরূপে—জার্মান ডুবোজাহাজের শয়তানীতে ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় কোনো জাহাজ কোম্পানীতে চাকুরী খুঁজছেন। পুলিশ গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিল তাঁর ওপর। মেলিন প্রথম দিকে সংবাদপত্রের মার্জিনে লিখে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আকস্মিক তল্লাসির ফলে তাঁর কাছে অদৃশ্য কালির সরঞ্জাম, সংকেতলিপির জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষার অভিধান ও পর্যটকদের গাইডবুক পাওয়া যায়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

নিতান্ত আকস্মিকভাবে একজন জার্মান এজেণ্ট ধরা পড়েছিল ইংল্যাণ্ডে। এর বেলায় দেখা যায় জার্মানরা পুরোনো আসামীদেরও শত্রুর দেশে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম। কোপেনহেগেনের ডাকবিভাগের এক কর্মচারী বার্লিনের একটা চিঠি ভুল

করে লণ্ডনের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাগে পুরে দিয়েছিল। চিঠিতে জার্মান ভাষায় লেখা ছিল লেক পেটেণ্ট গ্যাস-লাইটার বিক্রেতার ছদ্মবেশে সামরিক ও নৌ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের আশায় লণ্ডনে যাচ্ছে। সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চিঠিটা পাবার পর ব্রিটিশ গোয়েন্দাপুলিশ বুঝতে পারলো যে গ্যাস-লাইটার বিক্রির অছিলায় আরেকটী গুপ্তচরের আগমন হচ্ছে। কিছুকাল ধরে অনুসন্ধানের পর জানতে পারা গেল রবার্ট রোজেনথাল নামে এক যুবক স্কটল্যাণ্ডে গ্যাস-লাইটার নিয়ে ঘোরাঘুরির করার পর নিউ ক্যাসেল থেকে কোপেনহেগেনগামী ষ্টিমারে উঠে বসেছে। আর একটী ঘণ্টা পরেই সে তিন মাইলের সীমানা পেরিয়ে ব্রিটিশ আইনের গণ্ডী অতিক্রম করতে সমর্থ হতো। লোকটী অভিযোগ বেমালুম অস্বীকার করেছিল। তার কাছে চিঠিটাব উল্লেখ করাতে সে জানালো কোপেন-হেগেনে কস্মিনকালেও সে থাকে নি। সে জার্মান নয় আর যে হোটেল থেকে চিঠিটা লেখা হয়েছিল তার নাম কোনোকালেও শোনে নি সে। তার হস্তাক্ষর চিঠির লেখার সংগে মিলে যাবার পর চিঠিটা তাকে পড়ে শোনাতেই সে নাটকীয় ভংগীতে চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সামরিক কায়দায়। বল্লে, আমি জার্মান সৈনিক, সমস্ত কিছু স্বীকার করছি। রোজেনথাল কোনোকালেও সৈনিক ছিল না। অল্পবয়সে জালিয়াতির অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। যুদ্ধ বাধার সময় সে ছিল হামবুর্গে। তখন সে আমেরিকার রিলিফ কমিশনে কাজ পেয়েছিল। এর পর সে গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করে। বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডে এর পরে যে গুপ্তচরটী ধরা পড়ে, সে হচ্ছে একজন পেরু-ভিয়ান। লোকটীর নাম লুডোভিকো হারভিচ-ই-জেণ্ডার। লোকটী সত্যিকারের ব্যবসায়ী ছিল। বিদ্যাও কিছুটা ছিল তার। ১৯১৬ সালের

ওর অনুকূলে কিছুই বলে নি। বিচারে ওর চরম দণ্ড হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে শেষ নিহত গুপ্তচর সে ই।

যুদ্ধের সময় শত্রু-ব্যূহের ঠিক পশ্চাতে থেকে সংবাদ আহরণ ও প্রেরণ করাই হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তির সার্থকতা। এজন্য শত্রুর দেশে গুপ্তচরের পক্ষে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত পদে অধিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। কিম্বা বিরুদ্ধপক্ষের এমন একজনের সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন, যে নৌসংক্রান্ত বা সামরিক গুপ্ত তথ্যাদি জানে। যুদ্ধ চলার সংগে জার্মানরা ক্রমশ উৎসুক হয়ে উঠেছিল গ্রেট ব্রিটেনের মনোবল কোন্ পর্য্যায়ে আছে জানতে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওরা বিমানাক্রমণ ও ডুবোজাহাজী হামলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভুল রিপোর্ট পেয়েছিল। ওদের ধারণা ছিল ব্রিটিশজাতির সহনশক্তি ক্রমশ ভেঙে পড়ছে, তাই ওদের আগেই ব্রিটিশরা রণক্লান্ত হয়ে পড়বে।

প্রথম যুদ্ধকালে ব্রিটেনের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে যে কজন জার্মানদের ক্রীড়াপুত্তলী হয়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, সম্ভবত ইগ্নাটিয়স টিমোথি ট্রিবিৎস লিংকনই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই হাংগেরিয় ইহুদি ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সাংবাদিক, চার্চ অব ইংলণ্ডের যাজক ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৫ সালে দানিয়ব নদীর তীরে পাকস্ নামক স্থানে এর জন্ম। এব পিতা সচ্ছল ব্যবসায়ী ছিলেন—জাহাজ তৈরীর ব্যবসা ছিল তাঁর। ইগ্নাটিয়স জুইস চার্চে শিক্ষা গ্রহণ করে ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিশ বছর বয়সে লণ্ডনে এসে লিংকন আরো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। হাংগেরীতে ফেরার পর পিতাপুত্রে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ১৮৯৯ সালে ইগ্নাটিয়স হামবুর্গের লুথেরান চার্চে যোগদান করেন। পরে ইহুদিদের প্রেসবিটেরিয়ান মিশনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ক্যানেডায় আসেন। মিশনটী চার্চ অব ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হলে তিনি তাঁর কর্মপন্থা পরিবর্তন করেন। ইউরোপে

স্যর বেসিল লোকটীকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তরীণ করে রাখেন।

স্যর বেসিলের মনে জঘন্য রেখাপাত করেছিল এ্যালবার্ট মেয়ার, একজন ইহুদি। যেসব অল্পবয়সী ছোকরারা মেয়েদের সংগে মেশামেশি করে স্রেফ ফুর্তির জন্য, কাপ্তেনীর উদ্দেশ্যে বাড়ী ভাড়া করে বাড়ীওলীদের পয়সা দেয় না, কর্মস্থলেও মালিকদের প্রবঞ্চনা করতে যাদের বাধে না, মেয়ার ছিল তাদেরই একজন। সেন্সর কর্তৃপক্ষ অদৃশ্য কালিতে লিখিত একখানি চিঠি আটক করেছিলেন—তাতে প্রেরকের মিথ্যা নামঠিকানা লেখা দেওয়া ছিল। গোয়েন্দাপুলিশ চিঠিটা চেপে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের কয়েক হপ্তায় এই রকমের একই হস্তাক্ষরে লেখা প্রেরকের মিথ্যা নামঠিকানাসম্বলিত চিঠি সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছিল। লেখককে সনাক্ত করা না গেলেও এটুকু বোঝা গিয়েছিল সে বিদেশী কেউ হবে, লণ্ডনের কোথাও না কোথাও রয়েছে। দীর্ঘ অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর একটা ভাড়াটে বাড়ী থেকে এ্যালবার্ট মেয়ারকে ধরা হলো। আজ এ বাড়ী, কাল ও বাড়ী, এইভাবে এইভাবে ক্রমাগত বাড়ীবদল করে চলেছিল ছেলেটা, আর বাড়ীওলীদের ক্রমাগত ধাপ্পা দিয়ে আসছিল যে বিদেশে তার পিতামাতার কাছ থেকে টাকা এলেই ভাড়া মিটিয়ে দেবে। গুপ্তচরদের বিশিষ্ট ধরণের জীবনযাত্রা ওর বেলাতেও দেখা গিয়েছিল অর্থাৎ পকেটে পয়সা থাকলে নামকরা হোটেলে খেয়ে পয়সা ফুরুলে পরিচিত কারুর কাছ থেকে খাবার ধার করতো। মেয়ার তার কর্তৃপক্ষকেও ধাপ্পা দিয়েছিল—জার্মানদের অনেক মিথ্যা খবর সরবরাহ করেছিল সে। চিঠির লেখার সংগে তার লেখা যখন অবিকল মিলে গেল, তখন সে বলেছিল, চিঠিগুলো হচ্ছে ওর তথাকথিত কোনো বন্ধুর কারসাজি, তারা ওর হাতের লেখাটা পর্যন্ত নকল করেছে! ওর কাছ থেকে যখন অদৃশ্য কালিও পাওয়া গেল,

তখন জানালো, বন্ধুরাই ওর কাছে ওটা ফেলে দিয়ে গেছে। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

দণ্ডাজ্ঞার পরের দিনগুলিতে মেয়ার শান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিল। শেষের দিনে সেল থেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সে গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করেছিল। কিন্তু রাইফেলের সীমানার মধ্যে এসে গান বন্ধ করে সে সকলকে অশ্লীল গালি দিতে আরম্ভ করলো। জোর করে তাকে চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়। চোখের ব্যাণ্ডেজ সে সরিয়ে দিয়েছিল। গুলি করার পর ছটফট করতে করতে তার মৃত্যু হয়।

গুপ্তচর এলফ্রেড হাকনের চরিত্রটিও অদ্ভুত। এই তরুণ নরওয়ে-বাসীকে ব্রিটিশ পুলিশ ১৯১৭ সালের ২৪শে মে গ্রেপ্তার করে। ছেলেটীর মধ্যে অনেক গুণ ছিল—উপন্যাস লিখতে পারতো, ফিউচারিষ্ট ঢংয়ে ছবি আঁকতো, পত্র-পত্রিকার জন্য গল্প-কবিতা রচনা করতো। আমেরিকায় নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসে ছেলেটী। তারপর ১৯১৬ সালের শরৎকালে নরওয়েতে ছবি বিক্রির চেষ্টা করার সময় ওর আলাপ হয়ে যায় ল্যাভেণ্ডেল নামক জার্মান চিত্রকর ও হার্দার্ন নামক জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীর সংগে। ওর দুরবস্থার কথা শুনে হার্দার্ণ ওকে ইংল্যাণ্ডে জার্মান এজেণ্টরূপে যাবার পরামর্শ দেয়। হাকন প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়েছিল প্রথমে। পরে সে ভাবলো নরওয়েজিয়ান কাগজের ইংল্যাণ্ডস্থিত সংবাদদাতার পরিচয় গ্রহণ করলে গুপ্তচররূপে তার ওপর কোনো সন্দেহ পড়বে না, তাই একটী কাগজের সংগে প্রবন্ধ পাঠাবার ব্যবস্থা করে সে চলে এলো ইংল্যাণ্ডে। কয়েক সপ্তাহ কিছুই সে করে নি। শুধু কয়েকটা প্রবন্ধ লিখে ফিরে গেল নরওয়েতে। এই সময় তার পকেট শূন্য হয়ে এসেছিল, জার্মান

মিসেস্ ডিকার ছাড়া আর কাকেও দেখতে পেলেন না। পরবর্তী তদন্তে জানা গিয়েছিল মিসেস্ ডিকারের প্রাক-বিবাহ নাম ছিল সোফিয়া ব্লুম। তার ঠিকানাটা জার্মান সিক্রেট এজেণ্টদের চিঠি পত্রের ডাক-বাক্সরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভিইয়েরাকে গ্রেপ্তার করে তার ঘরে তল্লাসী করতেই অদৃশ্য কালির সরঞ্জামাদি আবিষ্কৃত হলো। কড়া জেরার মুখে ব্লুমের সংগে ওর যোগাযোগের যথার্থ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হতে একটুও বিলম্বও হয়নি। বিচারে প্রথমে প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেও সেটা বদলে ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

জোসেফ মার্কসের কথাও উল্লেখযোগ্য। স্যর বেসিল একদিন বিকেলে টিলবারির ডাকঘরে অফিসারদের কার্যকলাপ দেখেছিলেন, সেই সময় একজন তাঁর কাছে এসে চুপিচুপি বল্ল, পাশের ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একটা লোককে আনা হয়েছে, আপনি একটু সাহায্য করবেন আসুন। স্যর বেসিল লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি লিখেছেন : লোকটা যখন ঘরে ঢুকলো, মনে হলো যেন মাংসের একটা পাহাড় এগিয়ে আসছে সামনে। ছ'ফুট লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া ও মোটা। অন্তত ষোল ষ্টোন ওজন তো হবেই। স্যর বেসিলের ধমকানিতে কাঁপতে থাকলো সেই মাংসস্তূপ। তারপর গড় গড় করে সব কিছু স্বীকার করতে লাগলো।

আঁয়-লা-শাপেলের নামকরা ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছিল লোকটী। জার্মানরা তাকে তিন তিনবার ফরাসীদের পক্ষে গুপ্তচরগিরির অপরাধে অভিযুক্ত করেছিল। জার্মানরা পরে বলেছিল, সে যদি জার্মানদের পক্ষে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানকার নৌ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে পাঠাতে পারে, তাহলে ফরাসীদের গুপ্তচর বলে তার ওপর যে সন্দেহ রয়েছে সেটা থাকবে না। অগত্যা স্বদেশবাসীর হাতে গুপ্তচরের মৃত্যুবরণ

জার্মানীর নারী গুপ্তচর

রটারডামের এক জাহাজে লিসা ব্লুম নামের এক জার্মান মহিলা বার্সিলোনার জার্মান দূতাবাসে যাচ্ছিল। সংগে ছিল তার অনেক লট-বহর। সতেরোটা ট্রাংক বোঝাই ছিল মহার্ঘ কাপড়চোপড়ে। পরিচয় পাওয়া গেল দূতাবাসের কোনো কর্মচারীর গৃহকর্ত্রী বলে। সাধারণ কর্মচারীর গৃহকর্ত্রীর সংগে বিপুল পরিমাণ জিনিষপত্র ও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ থাকায় স্বভাবতই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের মনে। মাঝপথেই তাই জাহাজ থেকে নামানো হয়েছিল তাকে। ব্লুমের মুখ থেকে কোনো কথা পাওয়া না গেলেও ওর সংগিনী জানিয়েছিল, ব্লুম দূতাবাসের কৌন্সিলরের সংগে গোপন সম্পর্কে সম্পর্কিত। ব্লুমের বাক্সের মধ্যে ন'টী আয়রন-ক্রশ পাওয়া যায়, সেগুলি নাকি দূতাবাসের অফিসারদের কাছে পৌছে দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অনুমান করেছিলেন জার্মান গভর্ণমেণ্টের কোনো গোপন-বার্তা ব্লুম মৌখিকভাবে জানাবার জন্য যাচ্ছে। অগত্যা তাকে আটক করে রাখা ছাড়া উপস্থিত অন্য কোনো উপায় ছিল না ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে। ওর সংগিনী মহিলাকে অবশ্য গন্তব্যস্থলে যেতে দেওয়া হলো।

জার্মান গভর্ণমেণ্ট ব্যাপারটী নিঃশব্দে সহ্য করে নি। নিরপেক্ষ দুটী দেশের দূতাবাস মারফৎ কড়া প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্লুমের সম্ভাব্য চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেই জার্মানীর তরফ থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি।

১৯১৫ সালের শেষদিকে মাল্টার ডাকঘরে অদ্ভুত একটী টেলিগ্রাম

লণ্ডনে আসার পর ব্লুমসবারীর এক সস্তা হোটেলে উঠে ডাম্বারটনস্থিত তার পূর্বোক্ত বান্ধবীকে ইভা পত্র লিখে জানিয়েছিল, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে সেন্সরশিপ অফিসে কাজের জন্য সে দরখাস্ত করবার মনস্থ করেছে, বান্ধবী যেন তাকে ইংরেজ বন্ধুদের সুপারিশ জোগাড় করে দেয়। স্কচ মহিলাটী হ্যাকনিতে কয়েকজন পরিচিতের ঠিকানা দিয়ে তাকে দেখা করতে বলে। বান্ধবীর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে কারুরই দেখা না পেয়ে ইভা তার কার্ডে নাম ও ড্যানিশ লিগেশনের ঠিকানা লিখে চলে আসে। ড্যানিশ লিগেশনের মারফৎ তার টাকা আসার ব্যবস্থা থাকায় সে সেখানকার ঠিকানা উল্লেখ করেছিল। এরপর হ্যাকনির ভদ্রলোকদের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে সে দেখা করতে যায়, কিন্তু প্রথম আলাপেই নব পরিচিতদের মনে অস্বস্তির ভাব এনে দেয়। শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধির দিক থেকে ইভা ছিল নির্বোধ। নবপরিচিত বন্ধু-পরিবারের সংগে প্রায়ই বেড়াতে যেতো সে। ইংল্যাণ্ডে সে সময় জার্মান জেপলিনের হামলা চল্‌ছে। ইভা বন্ধুদের বিমানাক্রমণ প্রতিরোধব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন করতো: সব চেয়ে নিকটে যে বিমান-বিধ্বংসী কামান আছে সেটা সে দেখতে পারে কি? কটী বিমানবিধ্বংসী কামান আছে লণ্ডনে? আকাশের কতদূর পর্যন্ত তার গোলা উঠতে পারে?

ফিন্‌স্‌বারী পার্কে বেড়াতে গিয়ে ইভা বলেছিল, এই ফিন্‌স্‌বারী পার্ক! এখানে যে কামান আছে শুনেছি, সেটা কোথায়?

হ্যাকনির বন্ধুদের সেন্সরসিপ অফিসে তার হয়ে সুপারিশ দেবার অনুরোধ করেছিল ইভা। তার ভাব-ভংগী দেখে অনুরোধটাকে এড়িয়ে গিয়ে বন্ধুরা বলেছিল, সেন্সর কাজের দায়িত্ব অনেক বেশী। তেমন কিছু ঘটলে আমরা সকলেই বিপদে পড়বো। শুনে সে বন্ধুদের কাছে

যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্ধুদের স্মরণে ছিল ইভার কোনো একদিনের কথাগুলো: এখানে যা ঘটছে, জার্মানরা সমস্তই জানে। ওদের কাছে আপনারা কিছুই গোপন রাখতে পারবেন না।

কর্তৃপক্ষের নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম সংখ্যক সন্তোষজনক পরিচিত ইংরেজ বান্ধব না থাকায় সেন্সরসিপের কাজ জোটাতে পারে নি ইভা। ব্লুমসবারী ছেড়ে সে সাউথ কেনসিংটনে চলে যায়। কিছুদির পরে ফিরে এসে আপার বেডফোর্ড প্লেসের এক প্রাইভেট হোটেলে আস্তানা নিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা ছুটিতে ফুর্তি করতে আসতো সেখানে। ইভা সৈনিকদের সাথে আলাপ করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাদের উত্ত্যক্ত করতো।

যেটুকু তথ্য সে এইভাবে সংগ্রহ করেছিল তা মোটেই মুল্যবান ছিল না। তবু সে নিয়মিত পত্র মারফৎ সেগুলো লিখে পাঠাতো। ডাকঘরে ওর লেখা এমনি অনেক চিঠি আটক করা ছিল। সব চিঠিগুলির হাতের লেখা এক দেখে পত্র লেখক যে একই ব্যক্তি এটুকু জানা ছাড়া তার ঠিকানা ও পরিচয় জানার কোন সুযোগই পাওয়া যায় নি প্রথমে। হঠাৎ একদিন ওর চিঠির মধ্যে আপার বেডফোর্ড হোটেলের নামোল্লেখ পেয়ে পুলিশ কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলো, কিন্তু হোটেলে তিরিশ জনেরও বেশী অধিবাসী থাকায় আসল গুপ্তচরকে সনাক্ত করা সময়সাপেক্ষ বলে অনুমিত হলো। যে অফিসারটীর ওপর এ বিষয়ে তদন্ত করার ভার পড়েছিল তিনি একটা সহজ উপায় উদ্ভাবন করলেন। সম্ভাব্য সন্দেহজনক কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তিনি তাদের সংগে অন্তরংগতা স্থাপন করে প্রত্যেককেই পৃথক ভাবে নবাবিষ্কৃত ভয়াবহ এক গোপন যুদ্ধাস্ত্রের গল্প শোনালেন। সবচাইতে অবিশ্বাস্য ও প্রায় অসম্ভব গল্পটী শোনানো হয়েছিল ইভাকে। আর পরের দিনই ডাকঘরে ওকে যেমনটী শোনানো